এই তীর্থ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

—সাড়ে তিন টাকা—

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সাল

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীকানাই পাল

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

জ্যেষ্ঠতাত

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

এই লেখকের—

জনপদবধূ

সিন্ধুর টিপ

নীলসিন্ধু

দেবকন্যা

নীলাঞ্জনছায়া

তীরভূমি

বিদিশার নিশা

জলকন্যার মন

এক আশ্চর্য মেয়ে

একটি রঙ-করা মুখ

শ্বেতকপোত

এ জন্মের ইতিহাস

সীমাস্বর্গ

সমুদ্রের গান

এই তীর্থ

জীবন-প্রভাতে জীবনের যে ঘটনাগুলিকে একদা সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করেছি, আজ, জীবনের অপরাহ্ণে পৌঁছে, যখন সেইসব দিনের দিকে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়, তার মধ্যে অদ্ভুত একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। রয়েছে একটা পারম্পর্য। বোধ হয় জীবনের স্বরূপই এই। কোনো কিছুই হঠাৎ ঘটে না, কোনো ঘটনাই আশ্চর্যের কিছু নয়। ভেবে দেখলে, তার মধ্যে একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, একটা সূত্রও পাওয়া যায় খুঁজে। মনে হয়, কে যেন বহু পূর্ব থেকেই কতগুলি ঘটনার মাল্য রচনা করে রেখেছে আমার জীবনে। যা ঘটেছে, যা ঘটছে, আর যা ঘটবে, তা বুঝি সমস্তই আছে কোথাও আগে থেকে স্থির করা।

অনেকটা অদৃষ্টবাদীর মতো শোনাচ্ছে কথাটা, কিন্তু আমারও তা না-শুনিয়ে উপায় নেই। সারাটা জীবন ধরে অজস্র চিন্তা করে মানুষ, তার মধ্যে বহু মতি-পরিবর্তন ঘটে, যা ধারণা করি না, তাও একদিন ধারণা করে বসতে হয়। কিশোরকাল যাকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তার মানসিক চেহারাটাকে একটি কঠিন বস্তুতে পরিণত করে দিয়ে গেছে, তার পক্ষে 'ভাগ্যে যা আছে হবে' ভাবাটা যেমন শক্ত, তেমনি শক্ত মাত্র পুরুষকারকে আশ্রয় করে নিজের মন ও মননকে গড়ে তোলা।

দুই ধারণার দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে চলতে গিয়ে জীবনের প্রায় অপরাহ্ণে এসে দেখলাম, একটি ধারণা ঝরে গিয়ে, অন্য ধারণাটি কাঁটাগাছের ওপরকার প্রস্ফুটিত পুষ্পটির মতো দাঁড়িয়ে থেকে তার সুবাস বিকীরণ করছে।

এ-অবস্থায়, সাধারণতঃ কী হয় মানুষের? তখন হয় সে হয়ে দাঁড়ায় অদৃষ্টে পূর্ণ বিশ্বাসী, কিম্বা পূর্ণ অ-বিশ্বাসী। এবং তারই প্রতি-

ক্রিয়ায়, হয় জীবনের রূপ তার 'ইতি-ইতি', নয়তো 'নেতি-নেতি',— দুই বিপরীত ভাবের দুটো সুতো তার মধ্যে আর তেমন করে সম্ভবত জড়িয়ে থাকে না।

বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় আমার কী হয়েছে, সে আত্মকথন কিম্বা বিশ্লেষণের মুহূর্ত এখনো আসেনি। কিন্তু পিছন ফিরে যখন জীবনের বহু ঘটনার মধ্য থেকে এই একটি ঘটনার দিকে বিস্মিত আর বিমুগ্ধ মন নিয়ে তাকাই, তখন অদৃষ্টকে না মেনে আর উপায় থাকে না। মাত্র অদৃষ্টের লীলা না হলে, যে-দুটি মানুষের কথা আজ বলতে বসেছি, তারা আমার জীবনের নেপথ্য-লোকের বিচিত্র গ্রন্থিতে এমন করে জড়িয়ে যেতে পারতেন না! অথচ, আমার এই চল্লিশটা বছরের জীবনের পরিবেশে তাদের স্থান ছিল অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে। ক'বারই বা তারা এসেছে আমার সামনে?

হায়রে! প্রোজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সম্মুখে নট-নটী তাদের সাজ সজ্জায় রূপে-গুণে কথায়-গানে আমাদের মুহুর্মুহু বিমুগ্ধ করে চলেছে, কিন্তু তাদের নেপথ্যে থেকে যারা করছে তাদের সৌষ্ঠবকে সুষমা সঞ্চার তাদের কথা আমরা মনে রাখি কতটুকু?

আবার এক এক সময় মনে হয়, মানুষের জীবনটাই হচ্ছে এক বিচিত্র পথচলার ইতিকথা। আঁকাবাঁকা কতো বন্ধুর পথ, কখনো কোথাও গেছে বক্র হয়ে, কখনো সরল। কখনো বিস্তৃত, কখনো সঙ্কীর্ণ, কখনো উঁচুর দিকে, কখনো নীচের দিকে। যেতে যেতে পথের কতো মোড়, কতো বিভ্রম, কতো সংশয়! আনন্দও পেয়েছি, ব্যথাও পেয়েছি কম নয়। শৈশবে যদি কেউ একথা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতো, এ সংসারের সব পথই তীর্থপথ, সব পথেরই শেষে আছে এক বিশেষ সত্যের পীঠস্থান, তাহলে নৈরাশ্যের অবসন্নতা থেকে অন্ততঃ কিছুটা বেঁচে যেতাম। দেব-ভাবকে প্রস্তরীভূত করে আমরা রেখেছি মন্দিরে, সে-ও তীর্থ। কিন্তু যেখানে আছে দেব-ভাব জীবন্ত হয়ে মানুষের স্নেহ, ক্ষমা, প্রেম আর সাম্যের মধ্যে, দৈনন্দিন সংসারের সেই দিগন্তের

্যা দেবো কী ? এই তীর্থ। সংসারের এই তীর্থেও এসেছে কতো
ষ, কেউ মহান্‌কে জানিয়েছে প্রণতি, কেউ হয়েছে প্রণম্য।
দের কথা না বললে, তাদের আলোয় নিজেকে না দেখতে পারলে,
ত্মদর্শন আমার ঘটবে কেমন করে ?

শৈশবের কথা থেকেই শুরু করি। শৈশবের কথা, কী জানি
ন, একটি বিশেষ দিনের স্মৃতিই মনের কোণে আজও সমানভাবে
জ্বল করছে ! বছর বারো আমার তখন বয়স, উত্তর কলকাতার
বহু পুরানো বাড়ির একেবারে নীচের তলায়, কলতলার কাছা-
ছি একটা স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে থাকে আমার বিধবা মা—
াকে নিয়ে। বাবাকে যখন হারিয়েছিলাম, তখন আমার বয়স
র পাঁচেকের বেশী হবে না, আবছা মনে পড়ে বাবার সেই হাসি-
া মুখখানা। মেজো জ্যেঠামশাইয়ের মতো রাগ তাঁর কখনো
নি, বড়ো জ্যেঠামশাইয়ের সারাক্ষণ মুখ-কালো-করে থাকাও
নো তাঁর ছিল না।

তখন আমরা ছিলাম তেতলার বড়ো একখানা ঘরে, কী চমৎকার
জানো সেই ঘর ! এক আলমারী-ভর্তি পুতুলগুলোর কথাই বেশী
 আছে ! বঁটিতে মাছ কুটছে, গয়না-পরা একটি বউ-পুতুল আমার
া প্রিয় ছিল তখন। মা বলতো—বেনে-বউ পুতুল !

বাবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সব গেল ! মার কাছে শুনেছি,
ড়-চাপা পড়ায় বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে
র ফেরেননি বাবা ! কী-ভাবে কী হয়েছিল, অতো মনে করতে
রি না, আমরা একদিন চলে এলাম নীচের ঘরে, তখন আমাদের
প্রকাণ্ড খাটটাও নেই, বেনে-বউ পুতুলটাও নয় ! মা বলতো—
হয়ে গেছে বাবা !

াড়ার এক স্কুলে পড়ি বিনা মাইনেয়। বছর বারো বয়সে,
ারে সে স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে। এ ক্লাস থেকে পেরিয়ে ভর্তি
বে কোনো হাই স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে, এখনকার হিসাবে যা হচ্ছে

—ক্লাস দেভেন। বেশ মনে আছে, রাত তখন বেশ গভীর, পরীক্ষা সামনে বলে পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে গেছি, হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে দেখি, ঘরের কোণায়, যেখানে মা বাবার খড়ম, আর ঠাকুরদের ছবি সাজিয়ে রেখেছে,—তার সামনে, প্রদীপের আলোয় সোজা হয়ে বসে আছে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, আর কেমন কান্নাভরা চাপা সুরে মা গুন্ গুন্ করছে একটা স্তোত্র! বহুবার মার মুখে শুনেছি সেই স্তোত্র, তার সবটা মনে নেই, শুধু মনে আছে সে-রাত্রে মার কণ্ঠে অমনভাবে উচ্চারিত,—'ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ!'...

'সংসার-দুঃখ-গহন' যে কী মর্মান্তিক হয়েছিল মায়ের পক্ষে, তা তখন, সেই বাল্য বয়সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি, পারি আজ, যখন সেই সব নির্যাতনের দিন আর মায়ের কথা ভাবতে বসি!

পাড়ার কাকে ধরে যেন অতি কষ্টে অনতিদূরের হাইস্কুলে হাফ-ফ্রীতে আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিল মা। কিন্তু, সেই ক্লাস সবেমাত্র পেরিয়ে স্কুল থেকে যেদিন মাকে খবরটা দেবার জন্য ছুটে এলাম ঘরে দেখি,—মা একটা কথাও বলছে না, চুপ করে শুয়ে আছে বিছানায়, আশেপাশে দুটি-তিনটি বিধবা মহিলা, নিঃসম্পর্কীয়া, আমাদেরই মতো এ-বাড়ির আশ্রিত-স্বরূপা হবেন ওঁরা। আমাকে দেখে একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—শিগগির ঘটি থেকে গঙ্গাজল দে মুখে!

আরেকজন বললে—ছেলের মুখের জলটুকু পাবে বলে, প্রাণ গলার কাছে এসে ধুক্‌ধুক্ করছিল গো!

শুনলাম সব। ঘণ্টা দুয়েক আগে নাকি হঠাৎ 'বুকে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে' বলে কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে, আর তারপর—

কে যেন বললে—ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল গো! বারোটা মাস্ এ-তিথি ও-তিথি নিয়ে উপোস-টুপোস লেগেই ছিল, অতো উপোস কি মানুষের শরীরে সয়! সয় না।

যিনি মুখে জল দিতে বলেছিলেন তিনি বললেন,—বড়ো ভাগ্যি-মানী। কাউকে জ্বালালে না, কিছু না, এক ফোঁটা ওষুধ পর্যন্ত মুখে নিতে হলো না!

কিন্তু, মার কথা তো আজ ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে বসিনি, মা-হারানোর দুঃখ সব সন্তানকেই পেতে হয়, যদি না মার আগেই সে যায়! আমি তারপরে, ঐ বাড়িতে কোনক্রমে থেকে, প্রবেশিকাটা পাস করেছিলাম। আমাদের সেই তেতলার ফেলে-আসা ঘরে বড়ো জ্যেঠার বড়ো ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে বসবাস করছিলো, সে হঠাৎ কেন যেন কৃপাপরবশ হয়ে উঠল আমার ওপর। বললে—আর পড়তে হবে না।

বলে, আমাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলো এক মোটর মেরামতি কারখানায়। কালিঝুলি মেখে আসি জামায়-প্যাণ্টে, কিন্তু কাজ শিখি তো না কিছুই। মিস্ত্রীদের ফাই-ফরমাশ খাটা, 'চা নিয়ে আয়—বিড়ি নিয়ে আয়' এইসব ক্রমাগত শুনি আব রাস্তার দোকানে দৌড়ই, কিম্বা মেসিনের পাশটা ধবি, এটা মুছি, ওটা মুছি। হাতখরচ যা পাই, তা না লিখলেও চলে।

কেমন যেন যন্ত্রের মতো হয়ে গেলাম পাঁচটি বছর। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িতে দেয়ালে-দেয়ালে কতো যে ভাগ হয়ে গেল তার ঠিক নেই।—একদিন বড়ো জ্যেঠামশাই তাঁব ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিসে যেন কী সই করালেন, আর হাতে গুঁজে দিলেন—একরাশ নোট। বললেন—তোমার অংশ তুমি বিক্রী করলে!

তাঁর পাশে বসেছিলেন আরও অনেকে। কালো চাপকান পরা উকিল-চেহারার একটি লোকও ছিলেন বসে। আমি ততক্ষণে হাতে স্বর্গ পেয়েছি! গুনে দেখি, দেড় হাজার টাকা! সেই সময়, সারা-দিন কালিঝুলি মেখে—খারাপ গালাগাল শুনে যার দিন কাটে, তার কাছে ও-টাকার মূল্য সাংঘাতিক!

জ্যেঠামশাই বললেন—ঘরখানা ছেড়ে দিতে হবে। সম্পত্তি আমরা

বিক্রী করে দিলাম।

—কোথায় যাবো ?

বললেন—আমরা যে-রকম যে-যেখানে হোক ছিটকে যাচ্ছি, তুমিও যাবে, খুঁজে নেবে নিজের একটা আস্তানা। ছোটটি নও, বড়ো হয়েছো, সাবালক হয়েছো !

প্রতিবাদ, মার মতো আমিও কোনোদিন করি নি। উদয়াস্ত নিরামিষ-রান্নাঘর নিয়ে মা অজস্র খেটে যেতো, শুনে যেতো জ্যেঠীদের মুখনাড়া, কিন্তু কোনোদিন কোনো প্রতিবাক্য ফুটে ওঠেনি মায়ের কণ্ঠে ! আমাকে মা ডাকতো হাবুল বলে, তার এই হাবাগোবা হাবুলের মুখের দিকে তাকিয়েই বোধ করি অসহায়া মা মুখ বুজে সব সহ্য করে যেতেন ! মার যতো আবেদন-নিবেদন, সব ছিল ঐ পটে-আঁকা ঠাকুরদের কাছে ! সেই এক প্রার্থনা,—'সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ।'

তার এই 'হাবাগোবা' খেয়ালী ছেলেটির কিন্তু ঐসব ছবি-ঠাকুরদের প্রতি কোনো মমতা ছিল না ! বাড়ি ছাড়বার সময়, সবকিছু ছবি-টবি, কোশাকুশি; আমি অম্লান মুখে মায়ের বয়সী ও-বাড়ির আশ্রিতা বিধবাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এসেছিলাম !

টাকা উড়িয়ে দিইনি। চলে এসেছিলাম একেবারে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায়,—কালীঘাটের খুব সস্তা একটা মেসে। মিস্ত্রীদের সাকরেদগিরি করাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, ঐ টাকাটা সম্বল করে কলেজে পড়ব, আর মাসিক মেসের খরচটা টুইশানি করে চালাবো। হাতে-পায়ে ধরাধরি করার হীনতা কাকে বলে আমার জানা ছিল। তাই 'দরিদ্র ছাত্র' বলে কারুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম না, পুরো মাইনেতেই ভর্তি হলাম কলেজে। বাকী টাকা রেখে দিলাম পোস্টাপিসে, আর টুইশানি পাবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করতে লাগলাম। এ-সংগ্রামের ইতিহাসও বলে লাভ নেই। ছ'মাস পরে একটা নয়, দুটো টুইশানিই সংগ্রহ হয়েছিল। এইভাবে থার্ড-ইয়ারে যখন

উঠেছি, তখন কলেজী-বন্ধু সহপাঠীদের কেউ কেউ এই মুখচোরা ছেলেটিকে চিনে গেছে! আড়ালে বলতো—বাব্বাঃ! ওয়ান পাইস ফাদার মাদার! সিনেমা পর্যন্ত দেখে নারে!

—যা বলেছিস! মুখের কাছে শুধু বই আর বই!

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। পড়ার দিকে সত্যিই ছিল ঝোঁক। তবে, সবটাই যে পাঠ্য বই ছিল, তা নয়! কিন্তু, কলেজী বিদ্যার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগও হঠাৎ চলে গেল একদিন, অতি তুচ্ছ কারণে। বাংলার ক্লাসে—অধ্যাপক সেদিন পড়াচ্ছিলেন—

"তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

এই পর্যন্ত পড়েই বললেন—রবীন্দ্রনাথ এখানে অবশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ করেন।

চমকে উঠলাম। কী-যে হয়েছিল, কে জানে! কখন কী ঘটবে নিজেই কি জানতে পারে মানুষ! চুপচাপ-থাকা ওই যে দরিদ্র ম্লানমুখী সেদিনকার ছেলেটি, সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল—কখনই নয়!

শুরু হলো কথা-কাটাকাটি। উত্তেজনার মাথায় বলে ফেললাম —'পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা',—ও-পুরুষ আপনি নন স্যর!

প্রফেসর রাগে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন, একটি কথাও আর বললেন না, চলে গেলেন প্রিন্সিপালের কাছে। তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। রীতিমত তিরস্কৃত হলাম প্রিন্সিপালের কাছে। কিন্তু, কী যে হলো প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে, পড়াশুনার ওপরই জন্মালো অদ্ভুত এক বীতরাগ, ধীরে ধীরে একদিন কলেজ তো ছাড়লামই, সাধারণ পাঠের ওপর থেকেই মন চলে গেল।

অনির্দিষ্টভাবে পথে পথে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াই। খেয়ালমতো কখনো যাই গঙ্গার ধারে, নোঙর-ফেলা জাহাজগুলোকে দেখি বসে বসে। কখনো বা খেয়াল হয়, পূর্ণিমা রাত্রে ভিক্টোরিয়া

স্মৃতিসৌধ কেমন দেখায়, জানতে হবে। এক-একদিন সিনেমা-ভাঙা জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু ভিতরে গিয়ে যে একদিনের জন্যও ছবির কথা-কওয়া দেখে আসব, সে স্পৃহা জাগে না!

অনিয়ম হত্তে-হতে টুইশানি দুটোও একদিন ছুটে গেল। ফলে, দেখা গেল, পোস্টাপিসের পুঁজিও আসছে কমে। তবে, টুইশানি আর খুঁজব না, খুঁজব চাকরি। জমানো টাকার অঙ্ক দ্রুত শূন্যের দিকে এগিয়ে আসে, আমিও চাকরির জন্য, যাকে বলে 'হন্যে' হয়ে ঘুরে বেড়াই। আমার চার রুম-মেটের একজন ছিল বৃন্দাবন, সে একটা কী যেন করত, কিন্তু হঠাৎ তার সেটাও গেল। তাই, দুজনে হয়ে পড়েছি দুজনের সমব্যথী। হেঁটে হেঁটে কোথায় না গেছি, কাকেই বা না ধরেছি! এমন কি অভিমান ত্যাগ করে, জ্যেঠামশাইদের কাছেও গেছি, ভাইদের কাছেও গেছি। সবার মুখেই শুষ্ক এক উত্তর,—চাকরি কোথায়!

চাকরি নেই—চাকরি নেই!

পৃথিবীর সব রঙ, সব রসও বুঝি সেই সঙ্গে বিবশ-বিবর্ণ-বিশুষ্ক হয়ে গেছে!

এমন দিনে, কী করে, কার কাছ থেকে যেন খবর পেলাম, আমার দূর সম্পর্কের এক মাসতুতো ভাই—আমার বয়সীই হবে—ছোটবেলায় বার কয়েক তাকে দেখেছি, আমাদেরই বাড়িতে এসে—আমাদেরই ঘরে দিনকতক কাটিয়ে গেছে তার বিধবা মাকে নিয়ে—খাঁদু ছিল তার ডাক নাম—ভালো নাম—শশীশেখর চক্রবর্তী,—সে থাকে 'ভিজিয়ানাগ্রাম' বলে একটা জায়গায়—ভালো চাকরি করে—ইচ্ছা করলে চাকরি দিতে পারে।

বৃন্দাবনের কাছে গোপন করলাম সংবাদটা! কী জানি, ও-ও বেকার, যদি সন্ধান পেয়ে ওখানে চলে গিয়ে আমার সম্ভাব্য সুবিধাটুকু বিনষ্ট করে দেয়! অথচ, বন্ধু বলতে, একমাত্র সে-ই। তাকে শুধু বললাম—হ্যাঁ হে, ভিজিয়ানাগ্রাম কোথায় জানো?

—ভিজিয়ানাগ্রাম ! সে বললে—নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে ! তবে কোথায় ঠিক জানি না ! এসো না, টাইমটেব্‌ল খুঁজে বার করি !

—কোথায় টাইমটেব্‌ল !

—পাশের বাড়ির কত্তা তো প্রায়ই টুরে যায়। পাবো নাকি ? এসো তো দেখি ? পাশের বাড়িতে ছিল ই-আই-আর টাইমটেব্‌ল। তাতে ভিজিয়ানাগ্রাম নেই। আছে ও-বাড়িরই স্কুলে-পড়া একটি ছেলের ম্যাপে। বৃন্দাবন তা বার করে আমায় দেখিয়ে বললে—ও হরি, এ যে বি-এন-আর ! বি-এন-আর টাইমটেব্‌ল আছে হে ?

—না।

অবশ্য পথের বিবরণ, এমন কি ট্রেনের টাইম, ভাড়ার হার, এসব সংগ্রহ করতে বেশি দেরি হলো না। কিন্তু হিসাব করে দেখলাম, সবসুদ্ধ যে টাকাটা দরকার হবে, তার অর্ধেকটা হবে আমার পুঁজিতে। কী করি ?

অগত্যা ঐ বৃন্দাবনকেই বলতে হলো সব কথা খুলে। সে বললে, চাকরির ধান্ধাতেই যে তুমি 'ভিজিয়ানাগ্রাম' খুঁজছ, তা আমি আগেই বুঝেছিলাম। নইলে, খামোকা, কোথায় কোন্ শহর আছে, তার খোঁজ করে কে ?

তারপরে বললে—কুড়িয়ে কাচিয়ে আমি তোমাকে কুড়িটি টাকা পর্যন্ত দিতে পারি ! কিন্তু, ফট্ করে, খরচা করে গিয়ে বসবে ? একটা চিঠি লিখে দাও না ?

—ঠিকানা জানি না যে !—বললাম—বিদেশে বাঙালী বড়ো চাকরি করে, খুঁজে বার করতে অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে না, এই বিশ্বাসেই যাচ্ছি। তোমাকেও সঙ্গে নিতাম, যদি না—

ও বাধা দিয়ে বলে উঠল—তা আর নয় ! দুই বেকারের মুখ ভাইটি যখন দেখবেন একসঙ্গে, মুখখানা নিশ্চয় তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। তার চেয়ে, আজ আর টাইম নেই, কাল তুমি রওনা হয়ে যাও মাদ্রাজ মেলে। গিয়ে, একটা কিছু বাগিয়ে, আমায় চিঠি লিখো, আমি তল্পীতল্পা

নিয়ে হাজির হবো, কী বলো। তখন আবার যেন ভুলে যেও না?

—ছিঃ! তাই কি ভুলতে পারি।

রোগা, লম্বা চেহারা বৃন্দাবনের, মুখ দেখলেই মনে হয়, বহু ঝড় চলে গেছে ওর ওপর দিয়ে, বললে—মানুষের মন না, মতি! মতির আবার গতি বোঝা ভার! ভুলতে কতক্ষণ! তবে, ভাই, আর সব ভুলতে হয় ভুলো, বিশ টাকা যে ধার দিচ্ছি, সেটি ফেরৎ দিতে ভুলো না, ও আমার শেষ সম্বল!

ওর হাতদুটো ধরে বলে উঠলাম—অকৃতজ্ঞ আমি নই ভাই!

—কী বললে! —বৃন্দাবনের চোখ দুটো যেন মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠল, তারপরে সে দৃষ্টি কোমল করে নিয়ে এসে বললে—আর বোলো না। 'কৃতজ্ঞতা' কথাটা বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার। যে জীবনে সব ব্যাপারে সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞ থাকতে পারে, সে তো মানুষ-জন্ম থেকে উদ্ধার পেয়ে গেল! আসলে আমরা সবাই অকৃতজ্ঞ। বাপের কাছে অকৃতজ্ঞ, মায়ের কাছে অকৃতজ্ঞ, স্নেহের কাছে অকৃতজ্ঞ, ভালবাসার কাছে অকৃতজ্ঞ! আমাদের অকৃতজ্ঞতার কি আর সীমা আছে!

কথাটা আজ যেন তীরের মতো আমার বুকে এসে বিঁধছে? এক বিদেশী কাহিনীতে পড়েছিলাম, এক বিচিত্র রোগী আসত চিকিৎসকের কাছে ডান হাতের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে,—অথচ, বাহ্যতঃ কোনো ব্যাধি নেই,—সেই হাত থেকে যতক্ষণ না প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, ততক্ষণ তার মর্মান্তিক যন্ত্রণার শান্তি নেই! আমার হয়েছে সেই অবস্থা! যদি মনের দাহটা অঙ্গের কোথাও আত্মপ্রকাশ করতো, তাহলে শোণিত-মোক্ষণ করে আমিও হয়তো সেই রোগীটির মতো বলতে পারতাম,—আঃ! কী শান্তি!

কিন্তু, থাক, সেদিনের কথাই বলি। মাদ্রাজ-মেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভীড়ের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে কাটিয়ে সকাল সাড়ে ন'টা দশটায় এসে পৌঁছলাম—ভিজিয়ানাগ্রাম। মধ্যে, এক সময়, ভোর-ভোর যখন হয়ে আসছিল রাত্রিটা, পুঞ্জীভূত অন্ধকার যখন কুয়াশার মতো মিলিয়ে

যাচ্ছিল, তখন জানালার বাইরে চোখ রেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বিপুল জলরাশি—দিগন্তছোঁয়া—মাঝে মাঝে ছোট্ট দ্বীপ—উষার প্রথম করস্পর্শে স্থির জল রাঙা হয়ে আসছে! দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যেতে হয়। কখনো আবার চলন্ত ট্রেনের জানালার সামনে এসে পড়ছে গাছ-পালা-বনস্পতির আড়াল, কখনো সুষুপ্ত গ্রাম, তারপরে, আবার সেই সরোবরের মতো শান্ত জলরাশি! কোথাও জলের কিনারে সারি সারি নৌকো রয়েছে বাঁধা, কোথাও এক ঝাঁক ধবধবে সাদা বক রাঙা আলোর আভায় ডানা ঝিলমিলিয়ে এসে বসছে দলে-দলে! আবার কখন মিলিয়ে গেল সেই সরোবর চোখের সামনে থেকে, কী-একটা স্টেশনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলও গাড়িটা। তারপরে, আবার গতিলাভ করতেই,—বাইরে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারি না! আবার দেখলাম সেই বিপুল স্থির জলরাশি, ছেলেরা যেমন দোলের সময় একজন আরেকজনকে পিচকারী দিয়ে রঙের আঘাত করে, ঠিক তেমনি মনে হলো, দিগন্ত-বিস্তৃত সরল একটি রেখায় টকটকে লাল রঙ ছুঁড়ে দিয়েছে যেন কেউ,—অমনি সেখানে রঙটা গাঢ় হয়ে সিঁদূর টিপের বিন্দুর মতো গিয়ে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই রক্ত-রঙের ছটা! আয়নার মতো নিস্তরঙ্গ নিথর সরোবর এ-লীলার নীরব সাক্ষী। সে যদি চিরটা কালের মতো ধরে রাখতে পারত ওই রমণীয় চিত্রটুকু! পারে না। তাই বুঝি প্রতিদিন সে তার প্রতিটি জলকণাকে কেন্দ্রীভূত করে প্রতীক্ষা করে এই পরম লগ্নের।

কিন্তু, কতক্ষণ? আবার পরিবর্তন ঘটল চিত্রের! সেই সিঁদূর টিপের মতো লাল বিন্দুটি ক্রমশঃ বড়ো হতে হতে অকস্মাৎ লাফ দিয়ে সরমে দিগন্তরেখার ওপরে উঠে গেল! জমাট রক্তের মতো গাঢ় লাল রঙও যেন দেখাতে লাগল অনেকটা ফিকে! আর তারপরেই, গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সমস্ত ছবিটা গেল দৃষ্টির বাইরে, আমরা গাছপালা-ঘেরা এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম বলে যেন মনে

হলো! গতিও মন্থর হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরেই একটা স্টেশন। বহু যাত্রীই নেমে গেল মুখে চোখে জল দিতে। আর জানালার কাছে হকার ঘুরে ঘুরে কী যেন বিক্রী করছে। গলার স্বর ধারালো করে ডেকে উঠছে—পালু—পালু! কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। একজনকে ডেকে প্রশ্নও করলাম; এক হাতে তার বালতি, অপর হাতের ছোট্ট ঘটিটা উঁচু করে দেখিয়ে সে বলে উঠল—পালু—পালু দুধ—দুধ!

বুঝলাম। কিন্তু মন তখন উদ্বেগ হয়ে আছে অন্য এক প্রশ্নে! যেখানে সূর্যোদয় দেখলাম, ঐ দিগন্তবিলীন জলরাশি কিসের। আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি। ঐ কি সমুদ্র? সহযাত্রীদের মধ্যে একজনও বাঙলা-ভাষী ছিল না, তবু জিজ্ঞাসা করে ফেললাম একজনকে। সে ঘুম-ঘুম চোখে মুখখানা অপর দিকে ফেরাতে ফেরাতে কী যে বিড়বিড় করে বললে, বুঝলাম না। উত্তর দিলো আরেক ব্যক্তি। সে বললে—সমুদ্র নয়।

—তবে?

চিল্কা হ্রদ।

কিছুক্ষণ বিস্ময়াবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। ছোটবেলাকার ভূগোলে-মুখস্থ-করা বিচিত্র শব্দ—"চিল্কা"।—এই-ই!

বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। ভিজিয়ানাগ্রামে নেমে সুটকেস হাতে স্টেশনের বাইরে এলাম। কাকে জিজ্ঞাসা করব, শশীশেখর চক্রবর্তী থাকেন কোথায়? এবং কি করে যে ঘণ্টা তিনেকেরও বেশী এখানে-ওখানে ঘুরে, ঠোক্কর খেয়ে, অবশেষে আবিষ্কার করেছিলাম শশীশেখর চক্রবর্তীকে, সে ব্যাপারটাকেও ভাগ্যের লীলা আখ্যাত না করেই বা করি কি!

ছোটবেলায়, মা বলতো,—ও আমার হাবাগোবা ছেলে; কখনো সেটাকেই আদরের স্বরে পরিবর্তিত করে বলতো,—হাবোল-গাবোল। স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রাইজের ফিতে বাঁধা বইগুলো হাতে নিয়ে মার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মা বললে—ওরে হাবাগোবা!

—কলকাতা।

—হঠাৎ ?

—বলছি। কিন্তু তোর কি চেহারা হয়েছে, অঁ্যা ?

ম্লান হাসলো খাঁত্নু, বললে—আর চেহারা !

বারোটার পর খেতে এসেছিল, আবার বেরিয়ে যাবে। আমার স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে, যাকে বলে 'হুটি নাকে-মুখে-গুঁজে-ছোটা'—সেই করে তাড়াতাড়ি চলে গেল অফিসে, ফিরতে সেই রাত সাড়ে সাতটা। বললে—তুই এসেছিস, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম অনেক বলে কয়ে।

তারপরে, শুনলাম সব। শুনে মনে হলো, ও আমাকে চাকরি দেবে কি ওকে বরং চাকরি দিয়ে ওর এই সংকুচিত প্রবাসী-জীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে ভালো হয়। বললে—মা মারা গেছে রে, কাশীতে। টাকা-পয়সা ঠিকমতো পাঠাতে পারতাম না, ভালোমতো খেতে-টেতে না পেয়ে, একরকম উপোস করেই অকালে গেছে, মা।

একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে বললাম, এখানে এসে পড়লেই বা কী করে ?

—সে অনেক কথা ! খাঁত্নু বললে—দেশে চাকরি নেই, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যায়। তাঁরই অনুকম্পায় এখানে আসি। একা লোক, আছি একরকম, শুধু এই হাঁপানীর টানটাই বড়ো কষ্ট দেয় !

বলা বাহুল্য, সে কষ্ট আমি তুটি চোখ দিয়েই প্রত্যক্ষ করে এসেছিলাম। বললে—রোজ এরকম হয় না—এক-একদিন এরকম কষ্ট হয়ে যে—

বলে, একটু থেমে, একটু দম নিয়ে বললে—কতো তাবিজ-কবচ, কতো টোটকা ! কিছুতেই কিছু হলো না ! অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিল আমাদের কথাবার্তা। শেষে যখন টানটা তেমন না কমলেও, শ্রান্তির ভারে কম বলে প্রতিভাত হচ্ছে, তখন সে কোন্‌ক্রমে বললে

—কিন্তু, তুই হঠাৎ কেন এলি ? বললি না তো ?

সত্যি কথাটা কিছুতেই পারলাম না খুলে বলতে। শুধু বললাম —এমনি। শুনলাম, তুই এখানে আছিস, তাই।

—শুনলি ! কে বললে ! আত্মীয়স্বজনরা কেউ কেউ তাহলে আমার নাম করে।

ওর বলার ধরনে আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুমরে উঠল। মনে হলো, 'আত্মীয়' শব্দটা যে আজকের দিনে কতোটা পরিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা যদি ও সঠিক জানতে পারত ! কিন্তু, অসুস্থ মানুষটিকে সে-সত্যও জানাতে পারলাম না। মনের ভাব গোপন করে বললাম, —আত্মীয়রা সবাই তোর নাম করে। বিশেষ করে কার নাম তোকে করব বল !

—আ !—বলে ও যেন আরামে একটা নিশ্বাস ফেলল, বললে—বড়ো ভালো লাগলরে তোর কথা শুনে ! এবং আত্মতৃপ্তি এমনই ব্যাপার, যে, ব্যাধির জ্বালা পর্যন্ত অতিক্রম করে, দেখতে দেখতে ও পড়ল এক সময় ঘুমিয়ে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল আমারও। কিন্তু ভিতরের উদ্বেগ আর চিন্তা আমাকে যেন কুরে কুরে খেতে লাগল। বারবার উঁকি দিতে লাগল বৃন্দাবনের মুখ—সুবিধা বুঝলেই চিঠি লিখে দিস, তল্পী-তল্পা নিয়ে হাজির হবো।

খাঁদু বিদেশে বড়ো চাকরি করে, এ-খবর যারা আমাকে দিয়েছিল তাদের কথাও মনে পড়ছিল, যেন ধূর্ত শৃগালের মতো হাসছে তাদের মুখগুলি !

পরদিন সকালে উঠে সে বললে—কটা দিন থেকে যাবি কিন্তু তুই।

বললাম—পাগল ! আজই যেতে হবে আমাকে এখুনি। সকালে কোনো ট্রেন নেই ?

মুখখানা যেন ছায়ায় ঢেকে গেল ওর, বললে—তোর এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, নারে ? এই সামান্য, ছোট্ট হোটেলে ?

বললাম—ও-সব ভাবছিস কেন! আমার কাজ আছে।

বললে—তা বলে আজই যাবি? আজ থেকে যা।

কী জানি কেন, ওর এত অনুরোধ সত্ত্বেও আমার মন রাজী হলো না।

ও বললে—এসেছিস, যায়গাটাও তো ঘুরে দেখলি না! আজই যদি যাস তো মাদ্রাজ মেলে যা, সেই বিকেল চারটে পঞ্চাশে।

—তা' বরং হতে পারে।

ওর ভঙ্গিতে একটু উৎসাহ এলো, বললে—এক কাজ কর। বাস্-এ বরং সীমাচলম্ ঘুরে আয়, একে তীর্থস্থান, তার ওপরে দেখবার মতো যায়গা!

—সে আবার কোথায়?

ও বললে—আরও দক্ষিণে। মাইল তিরিশেক রাস্তা। বাসে বড়ো জোর ঘণ্টা দেড়েক লাগে।

কী মনে করে রাজী হয়ে গেলাম। এসব খেয়াল কেন যে হঠাৎ আসে, কেন যে হঠাৎ যায়, কে বলতে পারে! ভিজিয়ানাগ্রামে দেখবার মতো আরও কিছু যে না ছিল এমন নয়, বেছে-বেছে সীমাচলমে যাবার কথাই বা বললে কেন খাঁদু?

চা-বিস্কুট খাচ্ছি দুজনে বসে পাশাপাশি, ও বললে—সীমাচলমে আমার এক মা আছে, জানিস?

—মা!

—হ্যাঁরে।

একটুক্ষণ পরে আবার বললে—এগারোশ' সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। পাহাড়ের পর পাহাড়, তারই মাঝের এক উপত্যকায় —মন্দির।

ঈষৎ ভীতস্বরেই বলে উঠলাম—কিন্তু, অতোখানি উঠে, আবার নেমে, আবার বাস্ ধরে সময়-মতো ফিরতে পারব?

—খুব—খুব!—ও বললে···না হয় বড়জোর ট্রেন ফেল করবি।

২

যাবি কাল সকালে—জনতায়—আটটা চব্বিশে ট্রেন।

—বুঝলাম। এই তোমার ভিতরে-ভিতরে মতলব ?

একটু হেসে বললাম—মতলবটা কী খারাপ ? আর একটা দিন তোকে কাছে পাওয়া গেল।

—না ভাই, আমার যাওয়াই দরকার।—বললাম—ঠিক আছে, চারটে পঞ্চাশের মাদ্রাজ মেলই এসে ধরব। কিচ্ছু ভেবো না। সীমাচলম্ ঘুরতে আর কতক্ষণ লাগবে ? তোর মাকে দেখে আসব। তখনো সাড়ে সাতটাও বাজেনি। উঠলাম। তখুনি বেরুবো। তুইও বরং চল না আমার সঙ্গে ? সারাটা দিন এক সঙ্গে থাকা যাবে !

মুখখানা ম্লান হয়ে গেলে, সে চাকরিই করি কিনা আমি, যে কথায়-কথায় কামাই করব !

—অন্য চাকরি পাস না ?

—কোথায় আর পাই ! পেলে তো তখ্খুনি···

থেমে গেল। তারপরে বলল—তোর কথা তো কিছুই জিজ্ঞাসা করা হলো না।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—আমার আর কথা কী। নির্ঝঞ্ঝাট ! মা-বাপ্ নেই ! বেশ আছি একা একা।

—কাজকর্ম ?

—কাজকর্ম উপস্থিত নেই, তবে হবার খুবই আশা আছে, সেইজন্যই তো এতো যাবো-যাবো করছি ! মিথ্যা কথাই বললাম, এবং কিছুতেই একথা বলা হলো না যে, কাজের চেষ্টাতেই ছুটে এসেছিলাম ওর কাছে।

ও ততক্ষণে করেছে কী, আমার হাতদুটো হঠাৎ চেপে ধরল, বলল—হাবুল, চেষ্টা-চরিত্র করে আমাকে একটা চাকরি দিয়ে দেশে নিয়ে যেতে পারিস ! আমি তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকবো !

বলতে-বলতে ঝর্ঝর্ করে কেঁদে ফেলল খাঁদু। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—কী আশ্চর্য, একথা তুই বলবি, তার পরে আমাকে মনে

করতে হবে! তোকে দেখেই আমার মনে হয়েছে এ-কথা। দেখ্‌ না, এবার ফিরে গিয়ে, কী ভীষণ চেষ্টা করি, তোর জন্য! কিন্তু, তুই তোর সীমাচলমের মা-র কথা বললি না?

একটু সামলে নিয়ে বললে—কাজের সময় হয়ে গেছে ভাই। সীমাচলমের ওপরে উঠে—সামনেই একটা ছোট্ট পল্লীমতন, তার ডান দিকে আর বাঁদিকে তুটো পথ গেছে, তুটি পথই মিশেছে গিয়ে মন্দিরের সামনে। বাঁ-হাতি পথ ধরেই যাবার নিয়ম, আসবার নিয়ম ডানহাতি পথ ধরে। বাঁ-হাতি পথ ধরে চলতে শুরু করিল তো? সেটা যেখানে ডানদিকে মোড় নিয়েছে, সেখানে প্রথমেই বাঁ-হাতি পড়বে শিবের মন্দির, তারপরে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-চিহ্ন রক্ষিত স্থানটি, তারপরে মূল মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি। কেমন? এই যে শিবমন্দির থেকে আসল মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত পথটুকু, তার বাঁ-ধারে পুজোর উপকরণ নিয়ে বসে আছে কিছু লোক। নারকেল-কলা-কর্পূর কতো কী! ওর প্রথম দোকানটিই আমার মায়ের। মিশকালো রঙ্‌, কিন্তু ভারী লাবণ্যভরা চেহারা, ঢলো ঢলো তুই চোখ। বয়সে হয়তো আমার থেকে ছোটই হবে,—তবু সে আমার মা।

বললাম—ওটা কী করে হলো?

—সে অনেক কথা।—খাঁত্থ বললে—তুই ফিরে আয় তারপরে বলব। আমার এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে। তুই পারিস তো মার সঙ্গে আলাপ করিস। আমার নাম করে—বলেই, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল খাঁত্থ, বললে—ও হরি, তুই তো ভাষাই বুঝবি না। মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষা জানে না মা।

—তুই তাঁর মাতৃভাষা শিখেছিস?

—তেলেগু তো? তা একটু-আধটু শিখেছি বই কী। নইলে, চলছে কী করে? নে—আর দেরি করিস না, আয়, তোকে বাস্‌-এ তুলে দি।

খেয়ালের বশে এই যে সীমাচলম্‌-যাত্রা, এর মধ্যেও ভাগ্যের

লীলা কাজ করেছে বলতে হবে। খুব যে ধর্মপ্রবণ ছিলাম এমন নয়, বরং মন্দির আর ভীড়ের কথা মনে করে বহু তীর্থমন্দিরকে পরিহার করে গেছি। তাই বাস্-এ উঠে, ভীড়ের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে এককোণে বসে—কোথাও ভালো পথ, কোথাও মন্দ পথ পার হতে হতে আত্মমগ্ন হয়ে এ-কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ এ-খেয়ালে পেয়ে বসল কেন? খাঁতুর বিদেশিনী মায়ের প্রতি কৌতূহলই কি এর পিছনে কাজ করছে? তা-ও তেমন অনুভব করলাম না। সে কে, তাকে চিনবই বা কী করে, আর, তার ভাষা জানি না বলে তার সঙ্গে কথা বলবই বা কী করে?

কী একটা জায়গায় বাস্ এসে দাঁড়ালো। লোকজন, গরুর গাড়ি, ত্থ-চারটে লরীও আছে, গঞ্জের মতো যায়গাটা। হঠাৎ দেখি, রাস্তারই ধারে, একটা থামের মাথায় বোর্ডে লেখা আছে ইংরাজীতে—Korukonda.

পরে, বাস্ চলতে চলতে আরও এক জনপদে এসে থামল, তার নাম—আলমাণ্ডা। তারপরের—যায়গাটির নাম কণ্টকাপল্লী। এ একেবারে সত্যিই পল্লী: তালগাছের জটলাই বেশী—লাল প্রান্তরের মাঝে মাঝে কোথাও একক—কোথাও ত্থটি-কি-তিনটি একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুদূরে একটা আমবাগানও চোখে পড়ছে। অদূরে রাস্তারই ওপরে একটা শোয়ানো তালগাছের গুঁড়ির ওপরে বসে বৈরাগীমতো একটি লোক সারেঙ্গী-জাতের কী-একটা বাজনা বাজিয়ে গান ধরেছে। ভাষা বোঝবার কথা নয়, একেঘেয়ে একটা সুর কানে আসছে শুধু। ভাবলাম, এখানেই নেমে পড়লে কেমন হয়? একটিও বাঙালীর মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তার ওপরে সেই মন্দির আর ভীড়। কী হবে দেখে? দেখবই বা এমন কী? তার চেয়ে বিপরীতমুখী একটা বাস্ ধরে যথাস্থানে ফিরে যাই, মাদ্রাজ মেল ফেল করার আর ঝুঁকি থাকে না। শশী অর্থাৎ খাঁতুর সব কথা শুনে, ওর অবস্থা দেখে, মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল [illegible] যখন কিছু করতে পারব না, তখন

যত সত্বর সম্ভব ফিরে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু, চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যতো সহজ, কার্যে তা পরিণত করা অতো সহজ নয়। বাস্-টাস্ কখন ইতিমধ্যে চলতে শুরু হয়েছে, খেয়াল করিনি। গতি দেখে মনে হলো, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ভাগ্য আমাকে তার পূর্ণ শক্তিতে টেনে নিয়ে চলেছে সীমাচলমের দিকে, আমি যে হঠাৎ থেমে যাবো, সে সাধ্য আমার কোথায়? আজ ভাবি, সবই ভবিতব্য. নইলে এভাবে সীমাচলম্ আমি আসবই বা কেন, আর, যাদের কথা বলতে বসেছি, তাদের দেখা অমন করে বিস্ময়কর ভাবে পেয়েই বা যাবো কেন?

দূর থেকেই পাহাড়ের সারি চোখে পড়ছিল, ক্রমশঃ কী-কী যায়গা যেন ছাড়িয়ে এসে পড়লাম এক পর্বতের সানুদেশে। পাহাড়ের মাথায় অজস্র খাঁজ কাটা, ওপর থেকে নীচে,—মনে হয়, সিঁড়ির পর সিঁড়ি—প্রচুর সিঁড়ি তৈরী করে রেখেছে কারা বুঝি! কাছে এসে দেখি, সিঁড়ি নয়, আনারসের বিরাট বাগান, সারি-সারি, ধাপে-ধাপে আনারসের চাষ করে রেখেছে এখানে।

এই-ই সীমাচলম্। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে, দোকান-পাট, যাত্রীর আনাগোনা। তারপরেই বাঁ-দিকে সিমেণ্ট-করা একটা চত্বর, সেটি পার হয়েই মন্দিরের প্রথম তোরণদ্বার, তারপরে পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি, ধাপে-ধাপে ওপরে উঠে পাহাড়ের মধ্যে এক জায়গায় বিলীন হয়ে গেছে।

সিঁড়ির দু'পাশে দেওয়ালের মতো বেষ্টনী, তার গায়ে মাঝে মাঝে ইংরাজীতে নম্বর খোদাই করা আছে, যা থেকে বুঝতে পারছি, কতো ধাপ পার হয়ে এসেছি। সাতশো পর্যন্ত তেমন কষ্ট হয় না, তারপর থেকে বেশ দুর্রূহই মনে হয় সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে ওঠা।

অবশেষে পা দিলাম একটা সমতল স্থানে। বিরাট এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তার ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। তারই ছায়ায় বসে জনতকয়েক সাধু-সন্ন্যাসী। এগিয়ে গেলাম। আবার

কয়েক ধাপ সিঁড়ি। পার হবার পর, একটি পথে এসে পড়তে হয়। পথটি দুটি বাহুর মতো বাঁদিকে-ডানদিকে ছড়িয়ে গিয়ে বেষ্টন করে আছে অতি ক্ষুদ্র এক পল্লী। সবার মতো আমিও ধরলাম বাঁ দিকের পথটা। খাঁদুর সেই এদেশীয়া মায়ের কথা মনে পড়ল। আসতে গিয়ে প্রচুর যাত্রী চোখে পড়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও বাঙালী ছিল না। খাঁদুর সঙ্গে তার সেই মায়ের একটা স্নেহ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলে, আপাততঃ তাঁকেই একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু, কোথায় পাবো সেই পরিচিত ব্যক্তিটিকে? খাঁদুর *বর্ণনা-মতো শিবমন্দির পেলাম বটে,* পেলাম ফল-ফুল আর পূজার সামগ্রী বিক্রী করার অস্থায়ী দোকানগুলি, যাতে, পর পর দু-তিনটি দোকানে, দু-তিনটি মেয়ে বসে আছে। ওদের মধ্যে কোন্‌টি খাঁদুর মা, তা বোঝা কষ্টকর হলেও, সর্বপ্রথম যে-মেয়েটি বসে ছিল, তাকে যেন আন্দাজেই চিনে ফেললাম। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী বয়স বলে মনে হয় না, মিশকালো চেহারা, ঢল ঢল দুটি চোখ, গাঢ় নীলবর্ণের একটা শাড়ি পরে বসে আছে। মেয়েটি আমাকে দেখেই একটা নারকেল এগিয়ে দিয়ে কী যেন বলতে লাগল তাদের ভাষায়। বিক্রী করতে চাইছে, না, অন্য কিছু বলছে, ঠিক বুঝতে না পেরে একটু বিব্রত বোধ করে দূরে সরে গেলাম। মেয়েটির কানে দুল, নাকে নথ, বাহুতে তাগা, হাতে চুড়ি, গলায় হার। এক নাকেরটি ছাড়া আর কোনোটাই সোনার নয়, সব রূপোর। কিন্তু, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকলে লোকে কী ভাববে? তাড়াতাড়ি চলে গেলাম অন্যদিকে।

এইবার প্রধান মন্দির। দূর থেকেই মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে, দিনের আলো পড়ে ঝলমল করছে। সোনা দিয়ে মোড়া, না পিতল? আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি। সামনেই একটা ধ্বজদণ্ড, তারপরে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। খাঁদু বলে দিয়েছিল, তাই প্রথমেই টিকিট ঘরের খোঁজ করছিলাম। দু'আনার টিকিট কিনে তবে নাকি মন্দিরে প্রবেশ করা চলে।

প্রবেশ করে, দূর থেকে দেবতা দর্শন করে, ঘুরে ঘুরে মন্দিরের স্থাপত্যই দেখছিলাম। মনে হলো, এই একটা জিনিস সত্যিই দেখবার মতো। কোথাও হস্তীযূথের গতিটাকে ধরে রেখেছে শিল্পী, কোথাও নর্তক-নর্তকীর নৃত্যভঙ্গিমা। মন্দির-গাত্রই ঘুরে ঘুরে ভালো করে দেখছিলাম। নরনারীর অন্তরঙ্গ লীলার কতগুলি মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়! বিশেষ করে একটি মূর্তি আমাকে এমন আকর্ষণ করল যে বলার নয়। একবার দেখে, অন্যদিকে চলে এসেছি, তবু মনে হলো, আরেকবার দেখি গিয়ে ওটা!

ভাষা ওদের বুঝি না, কিন্তু অনুমান বলেও তো একটা শব্দ আছে অভিধানে! অনুমানে বুঝলাম, বিশেষ কোনো তিথি হবে আজ, মন্দিরের গর্ভ-গৃহের প্রবেশপথে তাই এত ঠেলাঠেলি—এত ভিড়। সে ভিড়ে আমিও গিয়ে পড়েছিলাম। চোখের চশমাটা ছিট্‌কে পড়ে আর কী! গায়ের পাঞ্জাবীটার ভাঁজ লোকের ধাক্কাধাক্কিতে এলোমেলো হয়ে গেছে।

ভিড় অবশ্য সবই অবাঙালীদের। তবু, তার মধ্যে, ভিড় ছাড়িয়ে মন্দিরের ধারে একটু ফাঁকায় গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, একটি অল্প বয়সী মেয়ে, তার মুখখানা ঠিক আর সবার মতো নয়, একটু যেন উজ্জ্বল, একটু যেন বেশী কোমলতায় ভরা! এক মুহূর্তের জন্য একটুখানি দেখা, মনে হয়েছিল, মেয়েটি তাকিয়ে বুঝি আমাকেই দেখছিল তখন! কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ওর চোখের দৃষ্টিতে।

আমি অবশ্য চোখ নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছিলাম অন্যদিকে। খুঁজছিলাম মন্দির-গাত্রের সেইসব আশ্চর্য শিল্প-নিদর্শনগুলি। দেখতে দেখতে চলেছি, আবার এক সময় হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, অদূরেই একটা থামের কাছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে,—আর আশ্চর্য, তার দুটি ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি আমারই ওপরে নিবদ্ধ। এবারে তার সিঁথি আর ঈষৎ টান করে চুল-বাঁধার দিকে তাকিয়ে

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মেয়েটি বোধ হয় এদেশীয় নয়। এদেশীয় মেয়েদের শাড়ি পরার ধরন, আর আমাদের আজকালকার মেয়েদের শাড়ি পরার ধরন,—এ ছুইয়ে বিশেষ কোনো তফাৎ ধরা যায় না, গায়ের জামার সঙ্গে সূক্ষ্ম একটু তারতম্য আছে। সেদিক থেকেও মনে হলো, মেয়েটি এদেশীয় নয়!

ওর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হলো বার ছুয়েক, কিন্তু এরই মধ্যে মেয়েটিকে কয়েকবার বিহ্বলভাবে মন্দিরের এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি বটে! কিন্তু ওর সম্বন্ধে অত কৌতূহলই বা আমার থাকবে কেন? পুনর্বার চোখ নামিয়ে চলে এলাম অন্যদিকে। সেই বিশিষ্ট মূর্তিটির শিল্পায়ন যেন আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছিল তখন।

ছোট্ট মূর্তি। প্রেমিকের কণ্ঠদেশ নিবিড়ভাবে ছুটি মৃণাল বাহু দিয়ে বেষ্টন করে, তাকে সপ্রেমে চুম্বন করছে একটি নারী। আবরণও নেই, আভরণও নেই, আছে শুধু সুঠাম একটি দেহভঙ্গিমা! ঈষৎ বক্র হয়ে আছে পৃষ্ঠদেশ, কবরী শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়তে-পড়তে থেমে গেছে বুঝি! কিন্তু, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই প্রেমবিহ্বলা নারীর; ছুটি বাহুতে তার জেগে উঠেছে ছন্দ, কটিদেশে তরঙ্গের উচ্ছলতা! মাত্র একটি নিরাবরণ দেহসুষমার প্রস্তরমূর্তি, তাও ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু দেহগত হলেও, যেন দেহাতীত এক বিশেষ মুহূর্তের ভাবকে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করে গেছে পুরাকালের শিল্পী!

কতক্ষণ ধরে দেখছিলাম ঠিক বলতে পারব না, হঠাৎ এক সময় চমক ভেঙে, চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে ঘুরতে গিয়েই দেখি, সেই মেয়েটি,—এবার আরও একটু কাছে। দেখে, হঠাৎ একটা চিন্তা, অন্ধকারে প্রদীপ জ্বলে ওঠার মতো, শিখায়িত হয়ে উঠল মনে। মনে হলো, আচ্ছা, মেয়েটি কি বাঙালী?

এদেশীয় মেয়েদের সিঁথিতে সিঁছুর নেই, এ-মেয়েটিরও নেই। ফর্সা-ফর্সা দোহারা চেহারা, ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গিনী, আঠারো-উনিশ বছরের

বেশী হবে না বয়স, মুখখানি ভারী কোমল! বড়ো-বড়ো দুটি চোখে কেমন যেন ভয়ার্ত, বিহ্বল দৃষ্টি!

আমার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবীই ছিল, সুতরাং আমাকে বাঙালী বলে অন্ততঃ বাঙালী কারুর পক্ষে চিনতে কষ্ট হবার কথা নয়। তাই, বাঙালী বলেই কি মেয়েটি তাকিয়ে ছিল আমার দিকে, অমন করে? হঠাৎ মনে হলো, বাঙালীই যদি হয়, তো এই বিদেশ-বিভূঁয়ে কোনো বিপদে-আপদে পড়েনি তো মেয়েটি।

নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু বুঝি-বা এগিয়ে গেলাম মেয়েটির দিকে। তারপরে, আর আকাশ-পাতাল কিছু চিন্তা না করে বলে উঠলাম—আপনি বাঙালী?

অদ্ভুত একটা আশ্বস্তভাব ফুটে উঠল সেই ভয়ার্ত, বিহ্বল মুখখানিতে, বললে—হ্যাঁ।

—বাঙালী!

আমার বিস্ময় বুঝি-বা আর সীমারেখা মানতে চায় না। অনুমানই করেছিলাম, কিন্তু সে-অনুমান যে প্রকৃতই এমনভাবে সত্যে পরিণত হবে, ভাবতে পারিনি। এবার ভেবে, মনে হলো, তাহলে হয়তো আমার পরবর্তী অনুমানও সত্য হয়ে দাঁড়াবে। মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম,—কী হয়েছে বলুন তো? অমন করে—

মেয়েটি বললে—আমি হারিয়ে গেছি।

—সে কী!

মেয়েটি বললে—মা-বাবাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

—কেন?

মেয়েটি হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনোক্রমে বললে—ভিতরে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম। ভীষণ ভীড়! ঠেলাঠেলি! ধাক্কাধাক্কি। কোনোক্রমে বেরিয়ে এসে দেখি, বাবাও নেই, মা-ও নেই।

আমি আরও কাছে গেলাম মেয়েটির। মেয়েটির এমন অবস্থা,

এখুনি বুঝি কেঁদে ফেলবে। বললাম—কোথায় আর থাকবেন? মন্দিরটা ভালো করে দেখুন। নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

—খুঁজেছি।—মেয়েটি বললে—তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু পাচ্ছি না।

—তাহলে?

মেয়েটি একটু যেন দম নিয়ে বললে—কী মুশকিলে যে পড়েছি! এদের ভাষা বুঝি না—কিছু না, চারিদিকে কোনো বাঙালীর মুখ নেই!

বললাম—এমন সময় আমাকে দেখতে পেলেন বুঝি!

মেয়েটি মুখ নীচু করে বললে—হ্যাঁ।

বললাম—আপনি ভাববেন না। আসুন, এবার দুজনে মিলে খুঁজি।

গর্ভগৃহের সামনে, সেখানে লোকজন ক্রমাগত সারি-সারি প্রবেশ করছে আর বেরুচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপরে এ-পাশে ও-পাশে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। নেই।

গেলাম বাইরে, মন্দিরের বৃহত্তর সীমানায়। লোহার শিক-বসানো বড়ো একটা ঘর আছে, তার ভিতরে নানারকম পুতুল সাজানো,—কিন্তু, সেখানেও তাঁরা নেই। এবারে একেবারে বাইরে। সেই শিবমন্দির আর ফুল-ফল বিক্রী করতে বসা কালো মেয়েটির কাছ পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে এলাম। চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন যেখানে রক্ষিত আছে, সেটিও দেখে এলাম। নেই।

মেয়েটি বললে—কী হবে?

বললাম—তাঁরাও খুঁজছেন, আমরাও খুঁজছি। ফলে, কেউ কাউকে পাচ্ছি না, এ-ও হতে পারে। চলুন, আবার যাই মন্দিরে।

মেয়েটি যেতে-যেতে এক সময় বললে—তাহলে যে আবার টিকিট কাটতে হবে!

—কাটব।

—আমার কাছে যে পয়সা নেই!

বললাম—আমার কাছে আছে। আসুন। অত ভাবছেন কেন?

দুজনে মিলে আবার গেলাম মন্দির-অভ্যন্তরে। কিন্তু বৃথাই ঘোরাঘুরি, কোথাও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আবার এলাম বাইরে। ওপরে কী একটা কুণ্ড আছে নাকি, তাতে স্নান করে সবাই। সেখানে যাননি ওঁরা? আরও সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠলাম দুজনে। কিন্তু, সেখানেও নেই। মেয়েটির দিকে এক সময় তাকিয়ে দেখি, ঘোরাঘুরির পরিশ্রমে আর অপরিসীম উৎকণ্ঠায় ওর কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ফরসা মুখখানা রৌদ্রে রাঙা হয়ে উঠেছে! সূর্য ততক্ষণে এসে পড়েছে মাথার ওপরে। ও যেন আর হাঁটতে পারছে না, টলে-টলে পড়ে যেতে চাইছে ওর ক্লান্ত দেহটা! ওর হাতখানা কি শক্ত করে ধরব হাত বাড়িয়ে? কি জানি, যদি কিছু মনে করে? আমি তো কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশিনি, ঠিক জানি না, কিসে, কখন, ওরা মনে কিছু করে, আর কখন মনে কিছু করে না।

এদিকে, ক্লান্তি আমারও কি লাগছিল কিছু কম? কিন্তু, আমি পুরুষ মানুষ, আমাকে সে-কথা ব্যক্ত করলে চলবে কেন?

ততক্ষণে ঘুরতে ঘুরতে সিঁড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। বললাম—তাঁরা হয়তো নীচে নেমে গেছেন। চলুন, আমরাও যাই।

মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো, বললে—কিন্তু, নীচে গিয়ে যদি দেখা না পাই?

বললাম—না পাই, নীচেই কোথাও অপেক্ষা করা যাবে। ওপরে থেকে থাকলে, একসময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওঁদের হবেই। আর তা না হলে বুঝতে হবে, বাড়ি ফিরে গেছেন ওঁরা। কোথায় উঠেছেন আপনারা, বলুন তো?

—এই কাছে?

—কতো কাছে?

মেয়েটি বললে—নীচে নেমে, একটু বাঁদিকে যেতে হয়। তারপরে আবার ডাইনে। একটু হাঁটলেই বড়ো একটা পুকুর। সেই পুকুর-

পাহাড়ে এক পাণ্ডার বাড়িতে। কালই আমরা ফিরে যাবো কলকাতা।

—কবে? কাল?

—হ্যাঁ।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—কাল তো আমিও যাবো। কে এখানে আর চিরটা কাল থাকতে এসেছে বলুন?

মেয়েটি আর কিছু বলল না। আমরা ধরলাম সিঁড়ি। কিন্তু, এগারো শ' সিঁড়ি ভেঙে নামাও কি সহজ কথা?

কিছুক্ষণ নামবার পরই, বেশ কয়েক শ' ফুট ধরে একভাবে সিঁড়ি নেমেছে একেবারে 'খাড়াই'ভাবে, তার ডানদিকে ঝরনাজলের পাইপ থেকে ছোট পাইপ নিয়ে এসে বোধ হয় খাবার জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের বারবার কল টিপে জল খাওয়ায় দরুন সেইখান থেকে জল গড়িয়ে-গড়িয়ে এসে এই 'খাড়া' সিঁড়িগুলিকে আবার বহুলাংশে করে ফেলেছে পিছল। ওঠবার সময় এতোটা ছিল না, যতোটা এখন পড়ছে চোখে।

বাঁদিকে, ধরে-ধরে ওঠবার বা নামবার জন্য কাঠের রেলিংয়ের মতো করা আছে। আপাততঃ ওঠবার মতো যাত্রী দু'একজন ছাড়া চোখে পড়ছে না, নামবার তাড়াই সবার বেশী। মেয়েটিকে সেই কাঠের রেলিং ধরবার পরামর্শ দিলাম। বললাম—ধরে-ধরে নামুন। সাবধানে নামবেন।

আমি তার পাশে-পাশেই নামছিলাম। অতি ক্লান্ত পদক্ষেপে, কোনোমতে সে নামছে, অন্য যাত্রী বা যাত্রিনীদের তাড়া আছে, ওর ধীর গতিতে বিরক্ত হয়ে কী যেন বিড় বিড় করতে করতে ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে আবার রেলিং ধরতে শুরু করল। মেয়েটি বিব্রত বোধ করে একসময় রেলিং ছেড়ে দিয়ে আমার পাশে সরে এলো, বললে—ওদের মতো জোরে চলতে পারছি না বলে ওরা রাগ করছে।

—কিন্তু, এভাবে কিছু একটা না ধরে কি পারবেন নামতে? বড়ো খাড়াই।

মেয়েটি বললে—বসে বসে নামব ?

বলে, তাকালো আমার মুখের দিকে, যেন আমি ওর অভিভাবক, আমার অনুমতি ওর একান্ত আবশ্যক।

বললাম—বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

তারপরে, কী যে হলো আমার মনের মধ্যে কে জানে, হঠাৎ বুঝি নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলাম—কিছু মনে করবেন না তো ? আমার হাতটা ধরুন শক্ত করে। তাতে দুজনের পক্ষেই হাঁটার সুবিধা হবে। থমকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, মুখখানা নীচু করা। কোথা থেকে কী-যে সাহস এলো আমার মনের মধ্যে তা জানি না, আমার মতো লোক, হঠাৎই দেখি, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছি ওর হাতখানা। শক্ত মুঠিতে ধরে, চলতেও শুরু করে দিয়েছি। আমাদের ছোটবেলাকার বৃহৎ বাড়িটার কথা পূর্বেই বলেছি। তার আলিসায় বাস করতো অনেক কবুতর। মনে আছে, একটি কবুতর হঠাৎ ধরে ফেলেছিলাম একদিন। একটা হাতের মুঠোয় সে রয়েছে, তার নরম—খুব নরম বুকটা ধক্ ধক্ করে যে সজোরে কাঁপছে, তা আমি বেশ অনুভব করেছিলাম সেদিন। মেয়েটির হাত আজ অতর্কিতে হাতের মধ্যে নিয়ে এসে, সেই ভীত, ত্রস্ত আর কম্পিত কপোতীর নরম—খুব নরম বুকের স্পন্দন যেন আরেকবার অনুভব করতে লাগলাম।

মনে হচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নামছি, আর ওর হাতখানা হাতের মধ্যে ভয়ানক কাঁপছে, ঘেমেও উঠেছে। কয়েকটা দুরূহ সোপান অতিক্রম করেই হাতখানা ছেড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে, সামান্য একটু সরেও গেল যেন সে। তারপরে, গতি হয়ে গেল আরও ধীর।

কী যে হলো, ওর মুখের দিকে কেন যেন কিছুক্ষণ তাকাতে পারছিলাম না আমি। মেয়েটি সন্তর্পণে নিজের হাঁটু ধরে ধরে চলবার চেষ্টা করছে, আমার সাহায্য পেলে ওর বুঝি ভালোই হয়! কিন্তু, সেটা বুঝেও, কিছু করতে পারলাম না আমি! কী-এক অদ্ভুত সংকোচ আমার মনকে যেন জোর করে অধিকার করে বসেছে!

এই রকম, নীরবে, স্তিমিত গতিতে কতক্ষণ যে চললাম আমার ঠিক মনে নেই! হয়তো সেটা এমন বেশী কিছু সময় নয়, কিন্তু মনে হচ্ছিল, যেন, কতো পল অনুপল গেল কেটে। আমরা পথ পার হচ্ছি, সে পথের বুঝি আর শেষ নেই!

একসময়, হঠাৎ চমক ভেঙে তাকিয়ে দেখি, মেয়েটি বাঁদিকে দেয়ালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার মুখখানার পাশ দিয়ে দেখা দেয়,—বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর তার মধ্যে সযত্ন-রচিত কয়েকটি ফসল-বোনা ক্ষেতের শ্যামলিমার আভাস। বললাম—কী হলো?

—পারছি না।

মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে, পাতলা ঠোঁটদুটি বিশুষ্ক; তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে, সে করল কী, হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরল আমার বাহুমূল, তারপরে কোনোক্রমে যেন পতন থেকে রক্ষা করল নিজেকে।

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—শরীর খারাপ লাগছে?

একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপরে, আমার বাহুর অবলম্বনটুকু ছেড়ে দিয়ে মাথা নেড়ে জানালো—না।

তারপরে, আবার চলতে লাগল, দেয়াল ধরে ধরে—ধীরে ধীরে।

এরও কিছুক্ষণ পরে, যখন আমরা প্রায় নীচে নেমে এসেছি, সামনেই প্রবেশ পথের তোরণ-দ্বার, এমন সময় মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, সবকিছু মুহূর্তে বিস্মৃত হয়ে আমার একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষে এলো, রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—ঐ যে! ঐ যে আমার বাবা আর মা!

মুখ তুলে, সামনে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তোরণের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক প্রৌঢ়া মহিলা, আর তাঁর পিছনে প্রায়-বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক, চোখে পুরু চশমা।

মেয়েটি পরক্ষণেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, বললে—ঐ যে দেখতে পেয়েছে। আসুন। বলে তরতর করে তাড়াতাড়ি নামতে যেতেই,

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম পিছন থেকে,—তা বলে অমন হুড়মুড় করে নামবেন না, পড়ে যাবেন।

সত্যিই দেখা পেলাম ওঁদের। তীর্থস্থানে ঘটনাচক্রে দুটি মানুষের সঙ্গে দেখা, এর পিছনে যে ভবিষ্যতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিভাস থাকতে পারে, সেকথা সেদিন ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি, এই নাম-না-জানা মেয়েটির বাবা আর মা একদিন আমারই জীবনের গ্রন্থিতে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে যাবেন। আজ যে প্রত্যক্ষলোকের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে আমার এই চল্লিশ বছরের বিচিত্র জীবন, তার নেপথ্যে যে ওঁদেরই থাকবে একদিন অসাধারণ ভূমিকা, সে-দিন সেই প্রাথমিক পরিচয়ের মুহূর্তে সে-কথা আমি স্বপ্নেও পারিনি চিন্তা করতে।

দুজনেই রুগ্ন চেহারার মানুষ, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, সাধারণ গৃহস্থ মানুষের চেহারা যেমন হয় আর কী! কিন্তু, আশ্চর্য ছিল ওঁদের মুখের হাসি। দুজনেরই মুখে যে স্নেহমণ্ডিত হাসি আমি সেদিন দেখেছিলাম, তা' আমার স্মরণে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। অদ্ভুত সারল্য সে হাসিতে, অদ্ভুত মমতা!

মেয়েকে অকস্মাৎ ওভাবে মন্দিরে হারিয়ে ওঁরা যে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তা মনে হয়নি। তবে, একটু ঘোরাঘুরির পরই ওদের মনে হয়েছিল, মেয়ে বোধহয় ওঁদের দেখতে না পেয়ে ওঁদের আগেভাগেই নীচে নেমে এসেছে।

—তাই নেমে এসেছিলাম বাবা।

ভদ্রলোক বললেন—আশপাশের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। ভাষা বোঝাতে পারি না, ওরাও বুঝতে পারে না। ঐ যে সামনের দোকানটা দেখছ, ওর দোকানদার একটু-আধটু হিন্দী জানে, তাই রক্ষে। বললে—বাঙালী মেয়ে ঐ বয়সের কেউ নেমেছে বলে মনে হয় না।

মহিলাটি বলছেন—দুজনে বাসায় গেলাম। দেখি, মেয়ে

আপনি। আবার ফিরে এলাম বাবা, এখানে।

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের পাণ্ডাঠাকুরটিকেও দেখতে পেলাম না, যে কিছু জিজ্ঞাসা করব। শুনলাম, তিনি যাত্রীর খোঁজে স্টেশনে গেছেন।

একটু হেসে আবার বললেন তিনি,—এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম বসে, তবে এদিককার লোকজন ভালো, দিনেত্বপুরে ভয়ের কিছু নেই!

মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়েছেন মহিলাটি, বললেন—মেয়ের মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। ভদ্রলোক বললেন—নারায়ণই সব মিলিয়ে দেন। নইলে, দেখ, বিদেশ-বিভূঁয়ে জানা নেই শোনা নেই—কাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন মেয়ের সঙ্গে!

আমার দিকে সস্নেহ কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহিলাটি বলে উঠলেন—তা তো বটেই। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কেমন যেন লজ্জাও হচ্ছিল। এ-রকম স্নেহকোমল কণ্ঠস্বরও আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত। চোখ ত্বটি নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি ছল ছল করে উঠতে চায়!

কোনোক্রমে বলে উঠলাম—আমি এবার চলি?

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—কোথায় যাবে? কাছেই কোথাও কি থাকো?

—না।—বললাম—এসেছিলাম কলকাতা থেকে ভিজিয়ানাগ্রামে একটা কাজে। এখন ভিজিয়ানাগ্রামেই ফিরে যাবো।

মহিলাটি বললেন—এত বড়ো রোদ্দুরটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে, একটু বিশ্রাম করে যাবে না বাবা? এই কাছেই আমাদের বাসা।

মেয়েটি এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এইবার অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—আমি তা বলেছি, মা।

ভদ্রলোক বললেন—এসো বাবা।

বললাম—বাস্-এ যাবো, আমার বোধ হয় দেরি হয়ে যাবে।

—কী আর দেরি হবে!—উনি বললেন—রোদ্দুর একটু কমুক, তারপরে না-হয় যেও। বিকেলের দিকে বাস্ কি পাবে না বাবা?

তা' হয়তো পাবো!—বললাম—আচ্ছা, চলুন।

মায়ের আড়ালে, একটি মানুষের ছুটি ডাগর-ডাগর চোখ যেন হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মনে হলো।

পথ চলতে চলতে ভদ্রলোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন আমার নাম-ধাম। প্রৌঢ়াও আগ্রহে শুনছিলেন আমাদের কথোপকথন। বলে উঠলেন—তুমিও ব্রাহ্মণ? তবে আর ভাবনা কী, বাবা? আমরাও ব্রাহ্মণ। সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছ, আমাদের সঙ্গে আমাদের ওখানে ছুটি মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করে তারপরে ফিরে যেও, কেমন?

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চলে এসেছি একটি সরোবরের ধারে। বাঁধানো ঘাটটা প্রথমেই পড়ে চোখে। কিছু লোক তখনো স্নান করছে। তার মধ্যে থেকে একটি লোক হঠাৎ-ই উঠে এলো আমাদের দেখে। রোগা, ফরসা চেহারা, মুখে দাড়ি; কালো কুচকুচে চাপদাড়ি কিছুটা ছেঁটে দিলে যেমন দেখায়, তেমনি আর কী। গায়ে ভিজে পৈতেটা জড়িয়ে আছে, মাথার সামনে থেকে আধাআধি কামানো, পিছনের বড় বড় চুলগুলি জলে ভেজা—পরনের ধুতিটাও তাই। হাতের ভিজে গামছাটা নিংড়ে নিতে নিতে লোকটি বলে উঠল আমাদের লক্ষ্য করে—দর্শন হো গিয়া?

ভদ্রলোক ওঁকে বোধহয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন এতক্ষণে, বললেন—পাণ্ডাঠাকুর! তারপরে, ভাঙা হিন্দীতে উভয় পক্ষে যে-কথোপকথন হয়েছিল, তার অনুবাদ সোজা বাংলায় করলে দাঁড়ায় এই—

—স্টেশন থেকে কখন এলেন?

—এইমাত্র।

—ঘরে গিয়ে বসুন, আমি স্নানটা সেরে যাচ্ছি।

—সকালে স্নান করলেন না আমাদের সঙ্গে?

—আমি তিনবার স্নান করি। আর একবার করবো, সেই

সন্ধ্যের আগে।

—আমাদের সঙ্গে একজন অতিথি আছেন।

—ভালোই তো। আমি মন্দিরে অনেকক্ষণ হ'লো লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। ভোগ এই এলো বলে। আপনারা বসতে-না-বসতেই ভোগ এসে যাবে। খেয়ে-দেয়ে দুপুরটা বিশ্রাম করুন। বিকালবেলা মন্দিরে উঠে আর দরকার নেই, রাজার বাগান-টাগান, এইসব ঘুরিয়ে দেখিযে আনব।

—ঠিক আছে ঠাকুরমশাই। কাল কিন্তু আমরা দেশে ফিরব, জনতা এক্সপ্রেসে।

—তাহলে কাল ভোরে উঠতে হবে। সাতটা উনিশে ট্রেন।

—আচ্ছা।

পাণ্ডাঠাকুর আবার নামলেন গিয়ে সরোবরে, তাঁর স্নান সমাধা করতে। আমরা ঘাট ছাড়িয়ে আরও একটু এগিযে এসে, বাঁদিকে ফিরে সরোবরের পূর্ব তীর ধরে চলতে লাগলাম। একটু চলার পরই ভদ্রলোক বলে উঠলেন—এই যে, এসে গেছি।

ভদ্রমহিলা আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে খুললেন ঘরখানা। ঘরের বাইরে একটা দরজা, ভিতরে একটা দরজা। মেয়েটি গিয়ে যখন খুলে দিল সেই ভিতরের দরজাটা, তখন বোঝা গেল, অন্তরালে আরও মানুষের অস্তিত্ব আছে।

ভদ্রমহিলা বিছানো মাদুরটা দেখিয়ে বলে উঠলেন—তোমরা ব'সো বাবা। আমি আসছি। বলে, মেয়েটির পিছনে-পিছনে তিনিও ভিতরের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

আগাগোড়া মাটির বাড়ি। মাথার ওপরে তালপাতা ছাওয়া। কিন্তু, সুন্দরভাবে নিকোনো ঘরটা, আর আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা ঘরখানি। ছোট্ট ঘর। পাশাপাশি দুটো মাদুর পাতা হয়েছে, মাথার কাছে বিছানা দুটি গুটানো, অতি সামান্যই বিছানা দুটির উপকরণ। এক কোনায় একটি মাটির গ্লাস। আর অন্যদিকে বড়ো একটা টিনের রং-চটা বাক্স।

ভদ্রলোক বললেন—পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ি। চেনা নেই শোনা নেই, স্টেশন থেকে আমাদের ধরে আনলেন ওঁর বাড়িতে। আমরা কালই মাত্র এসেছি। যেটুকু মিশলাম—আমার স্ত্রী আর কন্যাও মিশেছে ওঁদের মেয়েদের সঙ্গে—ভারী ভালো লোক। বৃদ্ধ পিতাঠাকুর আছেন, ভাইয়েরা আছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, নেই শুধু মা। তা' সবাই মিলেমিশে চমৎকার আছেন ওঁরা! মন্দিরের টোলে বাপের কাছেই সংস্কৃত পড়েছিলেন, ইংরেজী একটুও জানেন না বলে মনে দুঃখ আছে, তবে, বিদেশী যাত্রীদের সঙ্গে মিশতে মিশতে কথ্য হিন্দীটা ভাঙা ভাঙা আয়ত্ত করে নিয়েছেন, যেমন আমরা সব হিন্দী বলি আর কী!

ইতিমধ্যে ভিতর থেকে ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছেন মা আর মেয়ে। শালপাতায় কিছু কাটা ফল আর ভিজে মুগ, আর হাতে পাথরের গেলাসে ঘোলেব সরবৎ।

আমার সামনে এবং ভদ্রলোকটির সামনে সে-সব পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন—পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী দিলেন। এ-ও প্রসাদ। খেয়ে নাও বাবা। ভোগ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ শুধু মুখে বসে থাকবে কী!

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন প্রৌঢ়, বললেন—খেয়ে নাও বাবা, শবীরটা একটু ঠাণ্ডা হবে।

তারপরে ওঁদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—তোমাদের?

অপবিচিত বা স্বল্প পরিচিত মানুষের সামনে আহারের কথা তুললে মেয়েরা বোধহয় একটু লজ্জা পান। পিতার প্রশ্নের পর মেয়েটিও ভিতরের দরজাটির আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলে—প্রৌঢ়াও যেন কেমন কুণ্ঠাবোধ করতে লাগলেন। বললেন—সে হবে'খন। তোমরা প্রসাদ পেয়ে নাও দেখি!

বলে, মহিলাটি এসে বসলেন আমার পাশে। একটা তালপাতার পাখা নিয়ে অল্প-অল্প বাতাস করতেও শুরু করে দিয়েছেন। বললাম—না-না, তেমন গরম তো মনে হচ্ছে না!

উনি কি সে-কথা শোনেন ? পাশে বসে আমাকে খাইয়ে, তারপরে আমাদের দুজনের পাতা আর গেলাস উঠিয়ে নিয়ে উনি আবার চলে গেলেন ভিতরে।

এ এক আশ্চর্য নূতন স্বাদ আমার জীবনে। শুরু হলো আবার আমাদের কথোপকথন। প্রৌঢ়কে খুব খোলাখুলি-স্বভাবের লোক মনে হ'লো। মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা ছিলাম ওঁদের কাছে, কিন্তু তার মধ্যে শুনিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে ওঁদের সব পরিচয়। বললেন—আমার নাম অতুলেশ্বর ভট্টাচার্য। কালীঘাটের কাছে বাসা ভাড়া করে থাকি। আমাদের আসল বাড়ি ছিল যশোর, ঝিনাইদা সাব-ডিভিশনে। তা ছেড়ে দাও ওসব কথা। বাস্তুভিটে কি আর আছে ! বাবার আমলেই সব শেষ হয়ে গেছে। দেশে ঠাকুরদার ছিল টোল—পূজো-আর্চাও করতেন—যজমানও ছিল কিছু। এই পাণ্ডাঠাকুরের বাড়িটিতে এসে, আমার ছোটবেলার সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল, বাবা ! ঠাকুরদা গেলেন আমার বাবার মাথার ওপর ঋণের বোঝা রেখে—ঠাকুরদার দান-ধ্যানের অভ্যোসটা ছিল কিনা—পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন। বাবা ভিটে-মাটি বিক্রী করে সেই ঋণ শোধ করে চলে এলেন কলকাতায়। কী করবেন ? পূজো-আর্চায় পেট চলতো না—টোল খুলতেও গিয়েছিলেন—তা-ও চলেনি। শেষ বয়সে এক বাবুর বাড়িতে খাতা লেখার চাকরি নিয়েছিলেন। সেই চাকরি বাবার পর আমিই করছি বাবা। বাবুদেরও আর সেই বোলবোলা নেই, চলে যায় একরকম মধুসূদনের কৃপায়, এই আর কী ! তা ব্যাপারটা হ'লো কী, একদম ছুটি পাইনে, আমাদের আবার রবিবার বলে কোনো কথা নেই। অন্নদাতা, মুখ ফুটে প্রতিবাদ করাটা উচিত নয়। আজ এই ষাট বছর বয়স হ'লো, চল্লিশ বছর কাজ করে আসছি বাবুদের বাড়ি, এই এতদিনে দিলেন দিনকয়েকের ছুটি। একজন একটা পাস জুটিয়ে দিয়েছিলেন পুরী পর্যন্ত, তাই তো স্ত্রী-কন্যা নিয়ে তীর্থটুকু করে যেতে পারলাম বাবা, নইলে, গরীবলোক তীর্থ-করার সামর্থ্যটুকুও যে নেই !

পঁচিশ্ টাকা বেতনে ঢুকেছিলাম, তা বাবুরা ভালো লোক, আজকাল শ'খানেক টাকা করে দিচ্ছেন। আমার স্ত্রীর সন্তান বাঁচতো না, ঐ মেয়েটি আমাদের শেষ বয়সের সন্তান। ঐ একটিই। এই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়ল। নাম রেখেছি সাধ করে—সুদক্ষিণা। বলেই একটু থেমে, একটু হেসে বললেন—রঘুবংশের রাজা দিলীপের কথা মনে আছে তো বাবা। সন্তান-কামনায় নিঃসন্তান রাজা বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে কঠিন ব্রত পালন করছেন। সারাদিন কামধেনুর পরিচর্যা করে দিনের শেষে ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে আসছেন ফিরে, দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তৃষিত দুটি চোখ মেলে রানী সুদক্ষিণা, আর কবি বলছেন—রাজা ও রানীর মাঝখানে কেমন দেখাচ্ছে ধেনুটিকে? না, দিনক্ষপামধ্য গতেব সন্ধ্যা! দিন আর রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যার মতো। কেমন সুন্দর, নয় বাবা?

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম বৃদ্ধের মুখের দিকে, বললাম—সংস্কৃত আমার তেমন পড়া নেই।

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ, বললেন—আমারও কি পড়া আছে? উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে তো চাকরিতেই ঢুকেছিলাম! দু'একখানা প্রাচীন বই আছে পিতামহের আমলের, তাই একটু নেড়েচেড়ে দেখি মাঝে মাঝে।

একটু থেমে, অতুলবাবু আবার বলতে শুরু করলেন—মজা হয়ে দাঁড়ালো কী, বাড়িতে তো অনেক লোক? হ্যাঁ বাবা, বাড়িতে অনেক ঘর লোক, আমরা শুধু একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। লোকেরা অবশ্য খুব ভালো, কোনোদিন কেউ কোনো কলহ করেনি আমাদের সঙ্গে। তা তারা অতো বড়ো নামটা তো বলতে পারে না! 'দক্ষি' 'দাক্ষায়নী' এই সমস্ত বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত এক সময় দেখি, সবাই ওকে 'দুঃখী' বা 'দুখী' বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে, এমন কি ওর মা পর্যন্ত। আমি বললাম—ঠিক ওভাবে ওকে ডেকো না, অন্ততঃ 'দুখু' বলে সবাই যেন ওকে ডাকে, এটা লক্ষ্য রেখো। আমার ওসব অবশ্য বালাই নেই, আমার কাছে ও চিরকালের 'খুকু'।

অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত মুখখানা, হাসতে হাসতে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে এসে দাঁড়ালো—ভিতরে থেকে স্বয়ং পাণ্ডাঠাকুর, তাঁর একটি লোক, পিছনে পিছনে ভদ্রমহিলাটি, আর—না, 'খুকু' নয়, 'দুখু' নয়, 'দুঃখী'ও নয়—সুদক্ষিণা।

বড়ো একটা পিতলের গামলায় করে এসেছে অন্ন-ভোগ, কাঁসার বাটিতে তরিতরকারী, মাটির একটা ভাঁড়ে মিষ্টান্ন। কলাপাতা বিছিয়ে ভোজনের আয়োজন হতে লাগল অতঃপর। পাণ্ডাঠাকুর চলে গেলেন, মা আর মেয়ে দুজনে মিলে সামনে সাজিয়ে দিতে লাগলেন সব। আবার তেমনি মায়ের মতো পাশে বসিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি।

কিন্তু সে পর্বের আগে, আমি উঠে, সরোবরের জলে হাতমুখ ধুতে গিয়ে, যখন প্রস্তাব করে বসলাম—স্নান করে নিলে কেমন হয়? ভারী স্নিগ্ধ জল—লোভ হচ্ছে। তখন, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন পাণ্ডাঠাকুর স্বয়ং। বললেন—খুব ভালো। এই সরোবরে স্নান করলে সব অশুদ্ধি দূর হয়, এইজন্য এর নামই হচ্ছে—'কৃতশৌচম্।' গল্পটা জানেন না? দাঁড়ান, বলছি। স্নান করে নিন।

তারপরে, দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো সুদক্ষিণার দিকে তাকিয়ে বললেন—কই মা, গামছা আনলে না? দুটো গামছা এনো। বাবুজী স্নান করবেন।

মেয়েটি ভিতর থেকে যথারীতি এনে দিলো গামছা দুটি। বললাম—অসুবিধার সৃষ্টি করলাম তো!

কী এক অজ্ঞাত খুশির আভায় মুখখানি উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে, খুশি-খুশি দুটি চোখ মুহূর্তের জন্য আমার চোখের ওপর রেখে, পর মুহূর্তেই তা নামিয়ে নিলো। মাথা নেড়ে জানালো—না, কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না।

পাণ্ডাঠাকুর আমাকে নিয়ে গেলেন সেই ঘাটে। স্নান করতে-করতে দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি, ঘরের দরজার একটা পাল্লায় ঠেস্

দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—সুদক্ষিণা।

পাণ্ডাঠাকুর কিন্তু ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে তার কাহিনী, বললে—'হরম্ পাপম্' বলে এখানে একটা জায়গা আছে। ভগবান বিষ্ণু বিরাট এক বিড়ালের রূপ ধ'রে 'ইঁদুর-রূপী' মূর্তিমান পাপকে ধ্বংস করেছিলেন ওখানে। তারপরে আছে 'অহোবলম্' বলে একটা স্থান। সবই ঐ ওপরে, মন্দিরের কাছাকাছি। সীম্হাচলম্ অর্থাৎ 'সিংহ-অচলম্'-এ 'নরসিংহ' মূর্তি পরিগ্রহ করে, তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন ঐ 'অহোবলম্'-এ। ঐ সীমাচলমের মন্দির, ওটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রহ্লাদ—সেই পুরাকালে। যাই হোক, 'ইঁদুর' আর 'হিরণ্যকশিপু'কে বধ করে, তাঁর শরীর হয়ে যায়—যাকে বলে—রক্তস্নাত। সেই সমস্ত ধৌত করতে তিনি এসে স্নান করেছিলেন—এই—এই সরোবরে। সেইজন্য, এর নাম 'কৃতশৌচম্'।

তাঁর কথাগুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল বটে, কিন্তু আমার মনোযোগ ছিল অন্যদিকে নিবিষ্ট। মুখখানা তো দেখা যায় না এত দূর থেকে, শুধু দরজার কবাটে-হেলানো মূর্তিটাই পড়ছে চোখে, যেন অনেক কথার,—নির্বাক, অথচ বাঙ্ময়রূপ!

স্নান পর্বের পর পাণ্ডাঠাকুরটির সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা মাত্র, মহিলাটি বলে উঠলেন—এসো বাবা, এইবার বসে দুটি মুখে দিয়ে নাও। গামছা দুটো ওর হাতে দাও। নে তো মা দুখু, ভিতরে গিয়ে মেলে দে।—

গামছা ছুটে নিয়ে চলে গেল মেয়ে। এবং সেই যে গেল, যতক্ষণ না খেয়ে উঠেছি, আর এলো না ঘরের মধ্যে। খাওয়া হয়ে গেল। ভুক্তাবশিষ্ট-সুদ্ধ শালপাতাটা আমি মুড়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে ফেলে দেবো, কিন্তু, উনি তা ফেলতে দেবেন না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত বললেন—তোমার মা হলে তুমি কী করতে বাবা?

এর ওপর আর কথা চলে না। উঠে; বাইরেই গেছি অতুলবাবু আর আমি, উদ্দেশ্য, সরোবরের ধারে গিয়ে হস্তমুখ প্রক্ষালন করব:

কিন্তু, পিছন থেকে ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়াতে হ'লো,—বাবা? দেখি কাঁধের ওপর ভিজে গামছাটা ফেলা, হাতে প্রকাণ্ড একটা ঘটি,—দাঁড়িয়ে আছে সুদক্ষিণা। অর্থাৎ, জলের ধার পর্যন্ত যেতে হবে কেন, এই তো এনেছি জল?

ওর বাবার পরে আমি। বললাম—দিন, ঘটিটা।

কোনো কথাও বলল না, দিলেও না। চুপচাপ মাথা নীচু করে হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল।

ফিরে আসবার পর, মা আর মেয়ে গেলেন ভিতরে, আমার সামনে ওঁরা কিছুতেই যে খেতে বসবেন না তা আমি জানতাম। অতুলবাবু বললেন,—বিছানাটা পেতে দেবে? একটু গড়িয়ে নেবে বাবা?

—না—না, ঠিক আছে।

উনি বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, ওরা খাওয়াটা সেরেই আসুক। ওদের বেশ আলাপ-সালাপ হয়ে গেছে পাণ্ডাঠাকুরের অন্দর মহলের সঙ্গে। আমি চোখে একটু কম দেখি, তাই এঘর-সেঘর করার অভ্যেস একটু কম। তা তোমাকে তখন যা বলছিলাম বাবা। বড়ো সাধ ছিল, 'জগন্নাথ-স্বামী নয়ন-পথগামী ভবতু মে'! তাঁকে দেখলাম শেষ পর্যন্ত। খুকুর মা বললে—নয়ন সার্থক হয়ে গেল। বললাম—এতখানিই যখন এলাম, তখন চলো, সীম্‌হাচলম্‌ ঘুরে আসি! বেশি দূরে নয়। খরচ কোনক্রমে কুলিয়ে যাবে। মহাপ্রভুর চরণপূত 'জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র'—এ দেখবো না! এলাম চলে। পাণ্ডাঠাকুরটি সৎ ব্রাহ্মণ। বলেন চৈতন্য চরিতামৃত তেলেগুতে অনুবাদ করবেন। কেউ যদি ওঁকে বাঙলা শেখাতো! বাঙালী যাত্রী দেখলে তাই উনি সবার আগে গিয়ে আলাপ করেন। অথচ, দু'একদিনের জন্য সব আসে, তাদের দিয়ে ওঁর কী সাহায্য হবে! আমাকে বলছেন। বললাম—সে তো আমার মহাসৌভাগ্য। কিন্তু আমার পরের চাকরি, আমার পক্ষেও তো থাকা সম্ভব হবে না।

এই সব নানান্‌ গল্প। তারপরে, এক সময় প্রৌঢ়াও এলেন ঘরে।

এলো না সুদক্ষিণা। কিন্তু, কবাটের আড়ালে সে যে সুবিপুল আগ্রহ নিয়ে বসে আছে, এটা কি বুঝতে আমার বাকী থাকতে পারে? একদিকে, শুনে যাচ্ছি ওঁদের কথা, অন্যদিকে, সমগ্র চেতনা বুঝি উন্মুখ হয়ে শুনছে মৃদু একটু চুড়ির ঝংকার!

মা বললেন—ওখানে কেন? ভিতরে এসে বোস না?

কিন্তু, তবু সে এলো না সামনে।

মধ্যাহ্নের সূর্য ক্রমশঃ কোমল হয়ে এলো, ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পাণ্ডাঠাকুরটিকে নমস্কার জানিয়ে ভিজিয়ানাগ্রামের বাস্ ধরবার জন্য গেলাম এগিয়ে। অতুলবাবু বললেন—কালকের জনতায় যাচ্ছি বাবা, তোমার জায়গা রাখব। ভিজিয়ানাগ্রাম-স্টেশনে তুমি উঠে আসবে, কেমন? ভুলে যেও না যেন। কলকাতা পর্যন্ত একসঙ্গে বেশ যাওয়া যাবে। মেয়েকে আসবার সময় চিল্কা দেখাতে পারি নি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সবাই। পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রীর কাছে বুঝি জেনেছে, আসতে পথে 'চিল্কা' পড়ে।

বললাম—হ্যাঁ, আমি দেখেছি। সূর্যোদয় হচ্ছিল তখন। অদ্ভুত দৃশ্য!

মায়ের পিছনে দাঁড়িয়েছিল সে নিজেকে লুকিয়ে। দুটি বড়ো বড়ো বিস্মিত চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো এক মুহূর্তের জন্য। মাত্র মুহূর্তের সে বিহ্বল দৃষ্টি! মনে হলো, তরুণ দুটি স্বাপ্নিক চোখ নিয়ে পৃথিবীর সব রূপ, সব রস—সে গণ্ডূষে পান করে নিতে চায়!

ফিরে এলাম ভিজিয়ানাগ্রাম। সন্ধ্যাও পার হয়ে গেছে। শশার সেই হোটেল। ওর বিছানায় গিয়ে বসলাম। ওর এক রুমমেট্ ইংরেজীতে জানালো—এখনো সে আসে নি। চুপচাপ পড়ে রইলাম বিছানায়। মনে হচ্ছিল, অতুলবাবুদের সব পরিচয়ই তো তাঁরা দিয়েছেন! কিন্তু আমি তাঁকে বলতে পারলাম না কেন আমার সব! নাম বলেছি, ধাম বলেছি, কিন্তু, কেন বলিনি, আমি গরীব, আমি বেকার, চাকরির জন্য পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি!

রাত প্রায় সাড়ে আটটায় ফিরে এলো শশী। বললে—এইজন্যই তাড়াতাড়ি এলাম। আমার মন বলছিল, তোর গাড়ি আজ তুই ফেল করবি।

ওর বিছানাটা পেতেই শুয়েছিলাম, বললাম—তা' করলাম। কিন্তু, তোর শরীর কেমন? শশী আমার পাশে বসে পড়ে বলল—খুবই ভালো। কিন্তু, খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুলে টানটা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে কি না!

তারপরে বললে—এখনো খাস নি তো? আয়, আগে খেয়ে নি।

আহার-পর্বের পরে, দুজনে শুয়ে-শুয়ে গল্প করছি, এবং সত্যিই লক্ষ্য করছি, গত কালের মতো ওর সেই 'টান'-এর কষ্টটা দেখা দেয় নি। বললে—তুই যে যাস নি, ওটা এসে দেখতে পেয়ে মনটা খুব ভালো আছে। আর তাছাড়া, টানটা আমার সবদিন আসে না, তাহলে কি আর এ চাকরি করতে পারতাম! কিন্তু ওসব কথা থাক, কেমন সীমাচলম্ দেখে এলি, তাই বল্।

'সীমাচলম্'-এর প্রসঙ্গ ওঠামাত্র একটা অসংলগ্ন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—'কৃতশৌচম্'। একটু যেন অবাকই হলো শশী, বললে—কী বললি'!

কথাটা উচ্চারণ করেই কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করছিলাম নিজে। সেটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—'সীমাচলম্'-এ 'কৃতশৌচম্' বলে একটা সরোবর আছে, জানিস?

—না তো!

—তাতে স্নান করলাম। স্নান করলে শরীর-মনের সব অশুদ্ধি নাকি দূর হয়ে যায়!

ও একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বলল—খুব ঘুরেছিস বুঝি! আর কী কী দেখলি? যা দেখে, অর্থাৎ 'যাকে' দেখে, আমার সমস্ত শরীর-মন অভূতপূর্ব পুলকস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে আছে, তার কথা বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না ওকে।

শুধু বললাম—এক পাণ্ডাঠাকুর চৈতন্য-চরিতামৃতের তেলেগু অনুবাদ করতে চান, 'কৃতশৌচম্' সরোবরের তীরে তাঁর বাড়ি। একজন বাঙালী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। ভদ্রলোকের নামটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। তা' তুই মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে তাঁকে একটু সাহায্য কর্ না? তোর সেই 'মা'কে জিজ্ঞাসা করলে, সে হয়তো পাণ্ডাঠাকুরটির সন্ধান দিতে পারে।

শশী বললে—দেখলি আমার মাকে?

—দেখলাম।

—কী বললে?

একটু হেসে বললাম—বলাবলির ঊর্ধ্বে ছিলাম। কারণ, ভাষা বুঝবো কী করে?

শশী বললে—তা বটে। কিন্তু দেখলি তো? কালোর ওপরে লাবণ্যভরা চেহারাটা ভারী সুন্দর—না? আমার থেকে বয়স হয়তো কম, তবু আমি 'মা' বলেছি, না বলে উপায় নেই, মেয়েটির মধ্যে 'মাতৃভাব' যেন ফুটে বেরুচ্ছে সর্বক্ষণ!

—কে জানে। অতো 'ভাব' বুঝি না।

শশী আমার হাতটা চেপে ধরল, বলল—বিশ্বাস কর, এক-একজন ও-রকম থাকে। আলাপ করলে জানতে পারতিস, মেয়েটির আজও বিয়ে হয়নি। ওর এক বিধবা মাসী আছে, তার কাছ থেকে শুনেছি, এক-একটা সম্বন্ধ হয়, আর হঠাৎ-ই ভেঙে যায়।

—তোর সঙ্গেই বা আলাপ হয়েছিল কী করে?

—বলছি।

শশী শুরু করল,—কিছুদিন চাকরি করা হয়ে গেছে। মনিব মানত রক্ষা করতে মন্দিরে যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গী হয়েছি। তেলেগু-ভাষা কিছু কিছু বলতে পারি, বুঝতেও পারি। তবে এখনকার মতো নয়, এখন আমি তেলেগু-ভাষীই হয়ে গেছি বলতে পারিস।

বলতে-বলতে একটু হেসেই উঠল শশী, তারপরে বললে—সে এক

আশ্চর্য দিনই গেছে বটে! আমি অনভ্যস্ত মানুষ, ধীরে ধীরে উঠছি, মনিব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কখন ওপরে উঠে গেছেন কে জানে! হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করলাম, আমার সামনে—সিঁড়ির পর সিঁড়ি খাড়া হয়ে উঠে গেছে, ধারে-কাছে ওঁরা কেউ নেই! সিঁড়িগুলি তো তুই দেখে এসেছিস হাবুল, উঠতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল! যখন শেষ পর্যন্ত সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন, রীতিমত হাঁপ ধরে গেছে, শরীরে আর এক বিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই! ঐ যে শিব মন্দিরটা তুই দেখেছিস, কোনক্রমে ওর সিঁড়ির এক পাশে গিয়ে বসে পড়লাম। এতো কষ্ট হয়তো সবার হয় না, কিন্তু, আমার শরীর যে কেমন তা তো বুঝতে পারছিস! খট্‌খটে রোদ্দুর, অথচ, আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি হঠাৎ দিন শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে! আমার ডানদিকে দু-তিনটি দোকান সাজানো এটা লক্ষ্য করেছিলাম, এক সময় মনে হ'লো, তার প্রথম দোকানটি থেকে একটি মেয়ে উঠে এলো ধীরে ধীরে। বুঝলাম তার ভাষা, বললে—কী হয়েছে তোমার?

—কিছু না। হাঁপিয়ে পড়েছি।

বলছি বটে, কিন্তু, মনে হচ্ছিল, সব আলো বুঝি নিভে যাচ্ছে, ঘোর কালো রাত্রি নেমে আসছে।

মেয়েটি চলে গেল, আর তারপরে ঘটি করে কী নিয়ে এসে আমার পাশে বসে আমার মাথাটা ধরে ধীরে ধীরে খাইয়ে দিলো। বুঝলাম, কোথা থেকে গরম দুধ এক ঘটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে সে। আর কী অদ্ভুত, তার কিছুক্ষণ পরেই মনে হ'লো, চোখের সামনে থেকে রাত্রির ঘোর কেটে গেছে, আবার আলোয় আলোয় ভরে গেছে চারিদিক!

এ ব্যাপারটা দু-চারজন ছাড়া কেউ লক্ষ্য করেনি, সুতরাং, শহরে যেমন কথায় কথায় ভিড় জমে যায়, তেমনি ভিড় জমেনি আমাকে বেষ্টন করে। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—দুধের দাম কতো?

সে বললে—কেন?

বললাম—দামটা দেবো।

অদ্ভুত একটা বেদনার ছাপ লক্ষ্য করলাম তার মুখে, একটুক্ষণ থেমে থেকে সে বললে—দেশে তোমার মা আছেন না?

মা তখনো যাননি। বললাম—হ্যাঁ আছে।

সে বললে—তবে? তুমি যখন দেশে ফিরে গিয়ে তোমার মার কাছে এসব গল্প করবে, তখন কী মনে করবেন তোমার মা? বলবেন—ও-দেশে কি কোনো 'মা' নেই, আমার ছেলেটির অবস্থা দেখে যার করুণা জাগেনি মনে?

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম মেয়েটির মুখের দিকে। সে বললে—আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দাম দিতে চেয়ে আমার মনের ভাবকে অপমান করবে কেন তুমি?

তোকে কি বলব হাবুল, সেই থেকে সে আমার মা। পরে জেনেছিলাম, তার বিয়েই হয়নি। অথচ অদ্ভুত সে, মাতৃভাবে ভরপুর। প্রতি মাসে না হলেও, প্রায়ই মনিবের সঙ্গে যেতে হয় সীমাচলমে, দেখা হয়, দু-একবার দেখেছি—খোঁপায় ফুলের মালা দিয়ে রীতিমত সেজে বসে আছে সে। আমাকে দেখে একটু লজ্জাও পেয়েছে বুঝি! ব্যাপার কী? তার মাসীর কাছে শুনলাম, তাকে সেদিন দেখতে আসবে। অথচ, ঐ দোকানটিই তার সম্বল, ও-সময় তার পক্ষে ওটি ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই, সাজসজ্জা নিয়েই সে বসে আছে। কাছেই তার বাড়ি, আর-একটু উঠতে হয় পাহাড়ের ওপরে। খুব দরকার না পড়লে সে নীচে নেমে আসে না। কিন্তু, কী অদ্ভুত দেখ! ওকে 'মা' বলে ডাকবার পর, সে আমাকে সত্যিই ছেলের মতো দেখে। মা গেছে, কিন্তু ও'—এক আশ্চর্য মা পেয়েছি। গরীব মা, কিন্তু অন্তরে গরীব নয়।

বলে ফেললাম—আজ মা পেয়েছি আমিও।

খাঁদু একেবারে উঠে বসল, বলল—তার মানে!

সবটা বলতে গিয়েও এবারও সব বলতে পারলাম না। শুধু

বললাম অতুলবাবু আর তার স্ত্রীর কথা। হঠাৎ যেন আলাপ হ'লো, এ ভাবেই সাজিয়ে বললাম ওকে। ওঁদের অষ্টাদশী কন্যার কথাও আবছা বললাম। শুধু বললাম না সেই তার ভিড়ে হারিয়ে যাবার কথা, তাকে নিয়ে এগারো শ' সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসার কথা।

সবটা শুনে প্রচুর উৎসাহিত হয়ে উঠল খাঁত্ন, বললে—আমার মনে হয় কী জানিস! তোর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেবার ইচ্ছা হয়েছে ওদের মনে, নইলে হঠাৎ অতো 'স্নেহ' আসবার কথা নয়!

এবার উঠে বসেছি আমিও। যে-কথা এসে অবধি ওকে বলতে পারিনি, এবার উত্তেজিত অবস্থায় সেটাই বলে ফেললাম ওকে। বললাম—একে গরীব, তায় বেকার, বিয়েটা করব কী করে?

—কেন চাকরি তো পাবি!

বলে ফেললাম,—ছাই পাবো! তোর কাছে ছুটে চলে এসেছিলাম চাকরির খোঁজে, জানিস?

—তার মানে!

সম্বিৎ ফিরে পেলেও, মনে হ'লো, আর গোপন করা বৃথা। একে একে সবই খুলে বললাম ওকে।

মুহূর্তে ও যেন প্রস্তরীভূত এক মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। বললে—লোকে বলে, আমি বড় চাকরি করছি!

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বললে—জানিস? যে-কোন মুহূর্তে আমার চাকরি যেতে পারে! মনিবের ব্যবসার অবস্থা ভালো না, তার ওপরে, আমি বাঙালী ওদের সঙ্গে কাজ করছি, সেটা ওদের অনেকেরই সহ্য হচ্ছে না, লাগানি ভাঙানি লেগেই আছে! অথচ, তোর এত কষ্ট, হাবুল। যদি ছুটি অভাগা ভাই এক যায়গায় থাকতে পারতাম!

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ভাবিস না। কলকাতায় গিয়ে আমি এবার উঠে-পড়ে লাগব। তোকে এখান থেকে নিয়ে যাবোই।

খাঁত্ন বললে—আমার সীমাচলমের মা-ও তাই বলে। বলে—

এ কাজ ছেড়ে দিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও, এত পরিশ্রম তুমি সইতে পারবে না!

বললাম—ভাবিস না। মনে মনে, কেন জানি না, অদ্ভুত একটা জোর পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটোছুটি করলে চাকরি কি জোটাতে পারব না! আমি একটা জোটাতে পারলেই তোকে ডাক দেবো, তুই চলে আসবি। তারপরে, চেষ্টাচরিত্র করে তোকেও জুটিয়ে দেবো একটা কাজ।

চোখ দুটি ছলছল করে এলো খাঁদুর, হাত দুটো ধরে বললে—ভগবান তোর মঙ্গল করুন।

পরদিন সকালে—আটটা চব্বিশের ট্রেনে আমাকে উঠিয়ে দিতে এসেছিল খাঁদু। জনতার পিছন দিকে একটা কাম্‌রার জানলায় উৎসুক হয়ে বসেছিলেন অতুলবাবুরা। বললেন—এসো বাবা, তোমার জায়গা রেখেছি। তাছাড়া, তেমন ভিড় নেই আজ, দেখছ না! মা বললেন—এসো বাবা।

আর দুটি উজ্জ্বল চোখ নীরবে আমাকে জানালো অভিনন্দন।

অতুলবাবুর সঙ্গে শশীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম—আমার ভাই।

ও হেঁট হয়ে বৃদ্ধকে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন—এসো বাবা।

কিছুক্ষণ ট্রেনটা থেমে থাকে ভিজিয়ানাগ্রামে, কিন্তু খাঁদুর উপায় নেই বেশীক্ষণ থাকার। যেতে হবে ওর সেই বিচিত্র চাকরিতে। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ও একেবারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে—গিয়েই চিঠি দিস।

—নিশ্চয়ই দেবো।

—আর, যা বললাম।

—মনে থাকবে।

ইচ্ছা সত্ত্বেও আর থাকতে পারল না খাঁদু, তার চলে যাবার ভঙ্গি

দেখে মনে হ'লো, নিজেকে সে জোর করেই ছিন্ন করে নিয়ে গেল !

আমাদের দুজনকেই লক্ষ্য করছিলেন ওঁরা। আমি খাঁতুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যখন ওঁদের দিকে তাকালাম, দেখি, অজানিত ব্যথার স্পর্শে ছলছল করে এসেছে মায়ের চোখদুটি। আমাকে কাছে বসিয়ে খাঁতুর সব কথা উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। এটা ওঁর মমতা। কি এক মায়াময়ী মন আছে ওঁর, এমনভাবে কথা বলতে শুরু করেন, মনের সব খবর যেন উজাড় করে ঢেলে দিতে ইচ্ছা করে ওঁর পায়ের ওপর ! এটা প্রথমেই যে সঠিক উপলব্ধি করেছিলাম, এমন নয়। যখন সম্যক এটা বুঝলাম, তখন বহুদিন কেটে গেছে, বহুপরিবর্তন ঘটে গেছে বিশ্বের ! অবশ্য পরিবর্তনের স্রোত তো অহরহই বইছে। মানুষের মনে যখন যে-তরঙ্গের দোলা এসে সজোরে লাগে, সেটাকেই সে বিরাট আর্তনাদের দ্যোতক বলে মনে করে, এই মাত্র। না হয় তো, মুহূর্তে-মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে, কতো কি যে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, ঘটে যাচ্ছে কত কিসের আবর্তন, কতো ফুল সকালে ফুটে আবার দিনান্তে ঝরে যাচ্ছে, কতো ঢেউ বয়ে যাচ্ছে নদীর বুকের ওপর দিয়ে, —তার সংবাদ আমরা রাখছি কতটুকু ?

পথচলার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়েরও শেষ হয়ে গেল না, একথা বলাই বাহুল্য। কলকাতায় ফিরে আসার পর, ওঁদের বাসায়ও গিয়েছিলাম কয়েক দিন। কালী-ঘাটের কাছেই অন্ধকার-অন্ধকার একটা ছোট ঘর আর দাওয়া, মাথার ওপরে খোলার চাল। বহু ঘর নিয়ে বহু ভাড়াটে নিয়ে একটা বাড়ি। অবশ্য এর বর্ণনা আগেই শুনেছিলাম ওঁদের কাছ থেকে, সেই সীমাচলমেই।

প্রথম যেদিন গেলাম, অতুলেশ্বরবাবু ছিলেন না বাড়িতে। মা আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন বলে মনে হ'লো। সেই হাসি-হাসি মুখ। বললেন—এসেছ বাবা ! ভয় হচ্ছিল যদি না আসো ! দেখছ তো, আমরা কতো গরীব !

. বললাম—আমার কথাও তো বলেছি মা। আমিও গরীব। বেকার!

বললেন—উনি বলছিলেন, ওঁর বাবুদের উনি বলবেন তোমার কথা। যদি ওরা নেয়।

অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ব'সো বাবা। কই রে দুখু, কোথা গেলি? কে এসেছে দেখ্?

ঘরের ভিতরে ছিলাম আমরা। দরজার কবাট এই সময় নড়ে উঠল, মুহূর্তেই ওর আড়ালে কে এসে দাঁড়িয়েছে। মায়ের ডাকে বেরিয়ে এলো। সাধারণ লালপাড় একটা কোরা শাড়ি পরনে, মুখখানি নত। ধীরে ধীরে কাছে এল, হেঁট হয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে প্রণাম করেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

এরপর আরও তো কয়েকবার গেছি ও-বাড়িতে, কোনোবারই চোখের সামনে এসে বেশীক্ষণ দাঁড়ায়নি, প্রণামটা করে প্রতিবারই গিয়ে দাঁড়িয়েছে কবাটের আড়ালে। কিন্তু সেই প্রণামের মুহূর্ত-গুলিতে, আমার পায়ে দুটি কোমল হাতের ছোঁয়া, তার কি কোনোই বাণী ছিল না সেদিন? দুটি হাতের ছোঁয়া যেন আমার পায়ের ওপর অদৃশ্য অক্ষরে লিখে রেখে যেতে চায় ওর অন্তরের সেই গোপন কথাটি, যে-কথার কানাকানি নিয়ে আসে দক্ষিণ বাতাস, যে-কথা উন্মনা করে তুলতে চায় বিনিদ্র রাত্রিগুলি।

শশীকে এসেই চিঠি দিয়েছি, উত্তরও পেয়েছি ওর। আর ঘুরে বেড়াচ্ছি চাকরির চেষ্টায় দ্বিগুণ উৎসাহে। বারবার মনে হচ্ছে খাঁদুর কথাই সত্যি। ওঁর কন্যার বিবাহই বুঝি দিতে চান আমার সঙ্গে। কিন্তু, হায়রে, পাত্র হিসাবে এই ভাগ্যের কী-ই বা দাম!

বেশী অপেক্ষা করতে হ'লো না। অচিরে, একদিন ওঁদের বাসায়, ওঁরা মুখ ফুটে বলেই ফেললেন কথাটা। মা-ই বললেন—তুমি আমাদের পাল্টা ঘরের ছেলে। দুখুকে তুমি গ্রহণ করে আমাদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করো বাবা!

কিন্তু, কে কাকে উদ্ধার করবে ? একটা কিছু আয়ের পথ পাবার পর তবেই গিয়ে ওঁদের সংসারে আমার পক্ষে দাঁড়ানো সহজ হতে পারে। কিন্তু তার আগে, কোন্ যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়াবো ওঁদের সামনে, কোন্ যোগ্যতায় গ্রহণ করবো ছুটি কোমল হাতের নীরব প্রণামের স্পর্শ !

অতুলবাবু বললেন—আমার বাবুদের ওখানে একটা চাকরি খালি হয়েছিল বাবা, তোমার কথা বড়বাবুকে আমি বলেও রেখেছিলাম, কিন্তু শুনলাম, ছোটবাবুর এক সম্বন্ধীকে ওঁরা নিয়ে নিচ্ছেন।

আমি কোনো উত্তর করিনি। একটু পরে, কী-একটা যেন কাজের ওজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। সমস্তটাই যেন মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। আমার হাতের কাছে এসেছে আমার পরম সম্পদ, কিন্তু তাকে হাত বড়িয়ে কাছে টেনে নেবো, কোথায় সে সামর্থ্য ?

ধিক্কার এলো। ক'টা দিন আর গেলাম না ওদের বাড়ি। মন চেয়েছে, প্রাণ চেয়েছে, তবু জোর করে নিজেকে রেখেছি বেঁধে। বৃন্দাবন ছুতোরের কাজ শিখেছিলো, কী এক কাঠের কারখানায় জুটিয়ে নিয়েছে ছোটখাট কাজ, দৈনিক ছু'টাকা আড়াই টাকা সে উপায় করছে। তবে খাটুনী খুব বেশী। তার সঙ্গে আমার দেখাও হয় কম। সে একদিন দেখা হতে বললে—কিছু পেলে ?

—না।

এমনই একটা দিনে সোমেশ্বরপ্রসাদের সঙ্গে দেখা। সেই যে-কলেজে অধ্যাপকের সঙ্গে কলহ করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেই কলেজে সে ছিল আমার সহপাঠী। সহপাঠী ছিল অনেকেই, কিন্তু কারুরই সঙ্গে তেমন যোগ আমার ছিল না। আমার দারিদ্র্যজনিত একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান ছিল অন্তরে, সেই অভিমানই সম্ভবতঃ ছুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল আমার সঙ্গে তাদের। তবু, সেই স্মরণীয়

কলহকে কেন্দ্র করে যে দু'তিনটে ছেলে নিজে থেকে এসে বন্ধুত্ব করেছিল, সোমেশ্বরপ্রসাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। আসলে বিহারী, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে বাঙলাদেশে থাকার ফলে, চালচলনে আচার-ব্যবহারে বাঙালীই হয়ে গেছে বলা যায়।

—কি করছিস আজকাল পরমেশ?

বললাম—কিছুই না।

ও বললে—পড়াটা শেষ করেছিলি পরে?

—না। সে-পাট সেই কলেজেই চুকে গেছে।

সোমেশ্বর একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে—চাকরি করবি পরমেশ?

—তার মানে?

সোমেশ্বর বললে—তার মানে, আমি যে অফিসে কাজ করি, সে-অফিসে একজন লোক নেওয়া হবে শুনছি, তুই বলিস তো, চেষ্টা করি।

আবেগে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে গেল, ওরা হাতদুটো ধরে বলে উঠলাম—চিরকৃতজ্ঞ থাকব ভাই!

সোমেশ্বর বললে—ঠিক আছে। তুই দু'একদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে এসে দেখা কর্।

—কোথায়?

—আমার অফিসে আসতে পারিস।—বলেই সোমেশ্বর মাথা নাড়ল, তারপরে আবার বললে—না-না, অফিসে নয়, তুই আমার মেস্-এ আয়।

ভবানীপুর-অঞ্চলের একটা ঠিকানা আমাকে দিলো সোমেশ্বর, বললে—বাড়ির সব 'কল্যাণী'তে থাকে, সেখানে বাবা বাড়ি করেছেন শেষ বয়সে। আমি যাই শনিবার-শনিবার। কি আর বলবো, 'মেস্'-এর জীবন যাপন করছি। আসিস্ তুই।

বড়ো রাস্তাটা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল সোমেশ্বর, আর অন্যদিক থেকে একটা ট্রাম এলো, বাস্ এলো, কিছুক্ষণ পর্যন্ত•ওকে দেখতেই

পেলাম না। যখন পেলাম, দেখি, গলির মধ্যে অনেকটা দূর অবধি চলে গেছে সোমেশ্বরপ্রসাদ।

তা' ও যাক, কিন্তু যাবার আগে যে অদ্ভুত আশ্বাসের বাণী ও আমাকে শুনিয়ে গেল, তা আমাকে যেন মুহূর্তে নূতন এক মানুষে পরিণত করে দিলে। সেই কলেজের ঘটনার পর থেকে, আমি যেন খানিকটা ভবঘুরে স্বভাবের হয়ে গিয়েছিলাম। এক জায়গায় কখনো মন টিকত না। একটুক্ষণ কোনো ঘরে বসে থাকলেই মনে হ'তো যেন হাঁপিয়ে উঠছি। অভ্যাস হয়েছিল—চলা, শুধু চলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, কেবল আমি চলছি তো চলছিই। কখনো উদ্দেশে, কখনো নিরুদ্দেশে। কলকাতার—দক্ষিণ অঞ্চলে অবশ্য—এমন কোন্ রাস্তা আছে যা আমি হাঁটিনি, এমন কোন্ পার্ক আছে যেখানে আমি বসিনি?

সেই আমি, অবেলায়, অসময়ে ফিরে এলাম আমার সেই স্যাঁৎসেতে অন্ধকার মেসের ঘরে। ঠাকুর-চাকরদের অবাক করে দিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম আমার বিছানায়। একবার মনে হ'লো, কতদিন যাই নি! এই তো কাছেই, হেঁটে দশ-মিনিটের বেশী লাগবে না সময়। গিয়ে, খবরটা কি দিয়ে আসব? বলবো,—মা, আপনি আয়োজন করুন। আমি সুদক্ষিণাকে—

কিন্তু, কথাটা কি বলবো? পাণিগ্রহণ করবো আমি সুদক্ষিণার? না-না, সে ভারী নাটকীয় শোনাবে! তবে? 'আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।' সে প্রস্তাব তো ওঁদের কাছ থেকে আগেই এসেছে। তাহলে? কী বলব গিয়ে? বলব ছোট্ট কথা,—মা, আমি রাজী।

'রাজী!'—হ্যাঁ, এই কথাটি বেশ। ভরে গেল মনটা খুশিতে। ওঃ! কতদিন যাই নি! গুণে দেখতে গিয়ে মনে হ'লো, ইস! দশ-দশটা দিন কেটে গেছে!

না-না, আজও থাক। চাকরিটা আগে পেয়ে নিই। তারপরে যাবো, বলবো, "সে সৌভাগ্য কি আমি অর্জন করার যোগ্য?"—

কথাটা মন্দ শোনাচ্ছে না কিন্তু। কল্পনা করতে পারছি, কপাটের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, একটা চুড়ি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে আরেকটি চুড়িকে গিয়ে নাড়া দিলো ; 'ঠুং' করে সামান্য একটু শব্দ, কিন্তু মনে হবে, দিক-দিগন্ত জুড়ে যেখানে যতো তারের যন্ত্র আছে, সেই সব তারে উঠবে একযোগে আশ্চর্য এক ঝংকার ! বনে-বনান্তে, বনস্পতির শাখায় শাখায় ফিসফিস করে কানাকানি করে যাবে আচমকা বাতাস, পাখিরা আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিতে দিতে হঠাৎই চঞ্চু নামিয়ে এক মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকাবে, শরতের লঘু মেঘগুলি একে একে শুরু করবে তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা !

তর্ সইল না, পরদিনই গিয়ে উপস্থিত হলাম সন্ধ্যাবেলায়—সোমেশ্বরপ্রসাদের মেস্-এ। সে বললে—আজই এলি ? কাল আয়। আজ চা খেয়ে যা শুধু।

গেলাম পরদিন। ওর মুখখানা কেমন যেন অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে থম্থম্ করছে। বললে—আজও হয়নি। কাল আয়।

গেলাম। ও আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের ছাদের নির্জনতায়, তারায় ভরা আকাশের নীচে। বললে—আচ্ছা, পরমেশ, তোর সব কথা আমার সেদিন জানাও হয়নি। বাড়িতে কে কে আছেন তোর ?

—কেউ নেই।

—বিয়ে করিস নি ?

—না। তুই করেছিস ?

সোমেশ্বরপ্রসাদ বললে—না করলে এমন ঘানি টেনে মরছি কিসের জন্যে ? কিন্তু কী বলছিস তুই ! বিয়ে করিস নি ?

—না।

মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে উঠল সোমেশ্বর, বললে—তাহলে হতে পারে। আমার কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল, তুই বিয়ে করেছিস। লক্ষ্মীটি ভাই, কাল আয়। আজ আর কোনো কথা নয়।

ফিরে এলাম। যথারীতিতে রাত্রি শেষ হলো, সূর্য উঠল। এলো,

সোমেশ্বরের 'কাল'।

সারাটা দিন তীব্র প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রহর কাটিয়ে, আজও গেলাম ওর কাছে, সন্ধ্যার পর।

ও বললে—এসেছিস, বোস্। চা খা।

ওর কাছে বসে ওর হাতদুটো ধরে ব্যাকুল আগ্রহে বলে উঠলাম—কী হ'লো ভাই?

ও শান্ত কণ্ঠে বললে—মার্চেণ্ট অফিস, সে তো এতদিনে নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিস। একশ পচাত্তর টাকা মাইনে।

বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা যেন উত্তেজনায় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে মনে হ'লো, কোনক্রমে বলে উঠলাম—হবে চাকরিটা!

সোমেশ্বর বললে—হবে। নির্ঘাৎ হবে। কিন্তু, একটা সর্ত আছে।

—কী সর্ত?

ও আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালো, বললে—বিয়ে করবি?

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, তারপরে বলে উঠলাম অস্ফুট কণ্ঠে—বিয়ে!

হ্যাঁ—সোমেশ্বর বললে—আমাদের অফিসের বড়বাবু যিনি, তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। সাহেবদের আমলে যেমন সাহেবরা ছিল ওঁর হাতে, এ আমলে দেশী কর্তারাও তেমনি এসেছে ওঁর হাতে। লোকটা বশীকরণ জানে, বোধহয়। এই বড়বাবুরই হাতে আছে চাকরিটা। ভদ্রলোকের ছ'ছটি মেয়ে, ছেলে নেই। চারটি পার করেছেন। পঞ্চমটিকে বিয়ে দিতে চান, পাত্র খুঁজছেন। সেই মনোনীত পাত্রটির জন্যই সংরক্ষিত আছে ঐ চাকরিটি।

অস্বাভাবিক ধীর শোনালো আমার কণ্ঠস্বর। এ অবস্থায় এতো ধীর গলায় যে আমি কথা বলতে পারব, আমি নিজেই তা জানতাম না।

বললাম—আমিই কি সেই মনোনীত পাত্র?

সোমেশ্বর বললে—তোমার কথা আমি সব বলেছি। এক কথায় তিনি রাজী। এই মেয়েটি তাঁর একটু কালো, তদুপার একটু খোঁড়া, পাত্র পাওয়া সেইজন্যেই অতো সহজ হচ্ছে না। তবে, চাকরির প্রলোভন, আজ না জুটলেও, কাল ঠিক জুটে যাবেই পাত্র। এবার বল্, তুই রাজী ?

চুপ করে রইলাম।

ও আবার বললে—বেশ তো, তুই দুদিন ভাববার সময় নে। পরশু এসে তুই তোর মতামত জানিয়ে যাস।

—মতামত ?—বললাম—মতামত এখনই জানিয়ে দিচ্ছি সোমেশ্বর, আমার চাকরি নেওয়া হ'লো না। তোমার আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ।

বলে, আর দাঁড়ালাম না। উঠে, তাড়াতাড়ি চলে এলাম ওর মেস-এর দোতলা থেকে নীচে, পথের ওপরে।

আবার শুরু হলো ঘোরা। দিন নেই, সন্ধ্যা নেই, ঘুরছি আর ঘুরছি। সকালে বেরিয়ে যাই, ফিরি মধ্যাহ্নে। কোনোরকমে পেটে কিছু দিয়ে আবার যাই বেরিয়ে। ফিরতে রাত দশটার কম নয়। অফিসে অফিসে ঘোরা শুধু নয়, কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে দরখাস্তই শুধু নয়, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো, অনবরত ঘুরে বেড়ানো। যেন এক চলমান বস্তুতে পরিণত হয়েছি আমি, কে যেন কোথায় কেমন করে এক প্রবল নাড়া দিয়েছে আমাকে, আর আমি ক্রমাগত ছুটে চলেছি, থামবার উপায় আমার নেই। ড্যালহাউসীর বিভিন্ন বাড়িগুলি, জি-পি-ও'র ঘড়ি, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ওপরকার পুতুল, গঙ্গায় বয়ায় বাঁধা নিথর জাহাজ,—সবাই যেন সমস্বরে একটি কথাই আমাকে বলতে চায়,—প্রবেশ নিষেধ !

ভাঙা জীর্ণ যে বাড়িটায় আমাদের মেস, তারই দোতলার কোণার ঘরে থাকি আমরা দুজন, আমি আর বৃন্দাবন। কাঠের পার্টিশনকরা ছোট্ট ঘর, পাশাপাশি দুটো বিছানা মেঝের ওপরে পেতে ফেলা মাত্রই

দেখা যাবে, ঘর জুড়ে গেছে। আমি আর বৃন্দাবন আছি বটে, কিন্তু কাঠের আড়ালের ওপাশের যারা, তাদের সঙ্গেও আমাদের অনেক সময় বাক্যালাপ চলে শুয়ে। হয়ত কেউ জিজ্ঞাসা করলে ওপাশ থেকে,—কী ভায়া, হ'লো?

শুয়ে শুয়েই উত্তর দি—না।

বৃন্দাবন কালিপড়া লণ্ঠনের আলোর সামনে একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে ভাঁজ করে, তারপরে সেই ভাঁজ করা অংশটুকু পড়ছে। এই ওর স্বভাব। ও অংশটি পড়া হয়ে গেলে, অন্য ভাঁজ খুলে, তারপরে পড়বে। তা-ও খবরের কাগজ সে পড়বে কখন? সবার শেষে, রাত্রিবেলা, যখন সব খবরগুলিই যাকে বলে—'বাসী' হয়ে গেছে।

আড়াল থেকে প্রশ্ন এলো—বৃন্দাবন-ভায়া, করছ কী?

মুখ তুলে বৃন্দাবন বললে—র‍্যাঁদা ঘষছি।

পাশের ঘর থেকে বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,—অ্যাঁ! কী বললে?

বৃন্দাবন কণ্ঠ একটু উঁচুতে তুলে বললে—কাঠ সমান করতে হলে, মিস্ত্রী কি করে? র‍্যাঁদা ঘষে না? আমি তাই র‍্যাঁদা ঘষছি কপালের ওপরে। পাশের ঘরের ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে চলে গেলেন ও-ঘরে। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, হাওড়ার দিকে 'বড়গেছে' বলে কী একটা যায়গা আছে, সেখানে বাড়ি। সামান্য কী সেল্‌স্‌ম্যানের কাজ করেন যেন কোন্‌ ওষুধের দোকানে, শনিবার-শনিবার বাড়ি যান। ভবেশবাবু ভদ্রলোকের নাম। এসে বললেন—কই, ঘষছ কই? ও তো দেখছি—কাগজ পড়ছ।

বৃন্দাবন বললে—ভাঁজ করে র‍্যাঁদার সাইজে এনেছি দেখছেন না? একেবারে দশ-বাই-তিন সাইজ। দেখুন? আন্দাজে আন্দাজে করেছি, কিন্তু মাপে এক সুতোও ভুল হবে না।

—তা কপালে ঘষছটা কোথায়?

বৃন্দাবন বললে—কাগজ পড়ছি কতো জ্ঞান হচ্ছে, সেগুলি মগজে

যাচ্ছে, যেতে যেতে একদিন দেখবেন কপাল খুলে গেছে। সেগুনের টেবিল বানাবো, দর নেবো সেগুনের, কিন্তু, তার মধ্যে বেমালুম ভেজাল চালিয়ে দেবো, আপনি টেরটিও পাবেন না!

ভবেশবাবু একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবার পর অবশেষে হেসে ফেললেন, বললেন—ভেজাল শিখিও না ভায়া, ওষুধের দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান্, হ্যাঁ!

তারপরেই, বৃন্দাবনকে আর কোনো মন্তব্য করবার অবকাশ না দিয়ে, আমার দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন—পরমেশ-ভায়া গোঁজামিল দেবার অবকাশটা এখনো তাহলে পেলে না?

—গোঁজামিল!

ভবেশবাবু বলে উঠলেন—ভায়া, দুটো জিনিষ শিখে রাখো—ভেজাল আর গোঁজামিল। অফিসে বসে খাতা-লেখার মানেই তো গোঁজামিল অর্থাৎ বিশ্বময় যার যার খাতা, সে কি লেখে সবাই ঠিক করে? খোঁজ নিয়ে দেখ গোঁজামিল দেবার লোকেই বেশী। তাই বলছিলাম চাকরি, অর্থাৎ গোঁজামিল দেবার অবকাশটা পেলে?

হো-হো করে হেসে উঠলো বৃন্দাবন, তারপরে বললে—দশ-বাই-তিনের কথাই যে হ'লো দাদা! ঐ ভাগ্যের পিঠে র‍্যাঁদা ঘষা!

—তা ঘষো,—ভবেশবাবু বললেন, অর্থাৎ কর্ষণ করো—'উড়াইয়া দেখ ছাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্যরতন!'

ওরা দুজনে আরও কতো কী কথা বলতে লাগল তারপর, কিন্তু আমার মনে এসে লাগল ঐ একটি কথা—'উড়াইয়া দেখ ছাই!'

ওরা তর্কে মেতে আছে, আমি ধীরে ধীরে, প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বলা যায়, বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। বারান্দার কোণে একটা কাঠের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে উঠে এলাম ছাদে, ছাদে রেলিং বা প্রাচীর নেই, খোলা ছাদ। কৃষ্ণপক্ষের কোনে রাত্রিই হবে, অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অগণিত নক্ষত্র। একের সঙ্গে অপরের বুঝি আলোয়-আলোয় কথা যার অর্থ আমরা বুঝি না, জীবনের রূঢ় বাস্তব-

বোধ দিয়ে বুঝতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি, ঠকে মরি।

হঠাৎ মনে হ'লো ছাদের এককোণে মাদুর বিছিয়ে টিমটিমে ছোট্ট একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে, কে যেন বসে বসে খাতায় কী লিখছে। আমার আগে, যিনি লিখছিলেন, তিনিই আবিষ্কার করলেন, আমাকে বললেন—পরমেশবাবু না!

একটু চমকেই গিয়েছিলাম প্রথমটায়। তারপরে বললাম—হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর একটু ভারী, বললেন—এদিকে আসুন।

এলাম। আর কেউ নয়, আমাদের মেসের ম্যানেজার—সর্বেশ্বরবাবু। 'ম্যানেজার' বলে সবাই ডাকে, কিন্তু আসলে তিনি নিজেই মালিক।

বললেন—হিসেব নিয়ে বসেছি। নীচে হট্টগোল। এই নির্জন ছাদটি বেশ, কী বলেন? বসুন না?

অতি সন্তর্পণে, অপরাধীর মতনই বসলাম তাঁর মাদুরের প্রান্তে। পুরনো বাসিন্দা আমি, তাই এতদিন কিছু বলেননি উনি। নইলে, চার মাস টাকা বাকী ফেলে রাখলে কোনো মেসের মালিকই ছেড়ে কথা বলে না।

যা ভাবছিলাম, তাই হ'লো। মালিক বললেন—চার মাস। মনে আছে তো?

কোনক্রমে বললেন—আছে সর্বেশ্বরবাবু। কিন্তু—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'কিন্তু'র কথা থাক পরমেশবাবু। আপনি পুরনো লোক, তাই বলছি কোনো 'কড়ার' করবেন না। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে দেখুন, আমিও ছা-পোষা মানুষ, আপনাদের কাছ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়েই আমার দিন চলে।

বলে উঠলাম—আর লজ্জা দেবে না সর্বেশ্বরবাবু। আমি—ট্যুইশানীগুলি পর্যন্ত খুইয়ে বসে আছি! এক ছাত্র বাইরে গেল, আর এক ছাত্র পাশ করে কলেজে পড়তে গেল, মানে—। এবারেও বাধা দিলেন, বললেন—বুঝি সব। কিন্তু চাকরি আপনাকে পেতেই হবে।

উঠে পড়ে লেগে যান। পেটে কিছু বিদ্যে আছে, চাকরি না হয়ে যায়? মুরুব্বি ধরুন মশাই, মুরুব্বি ধরুন, নইলে কিছু হওয়া শক্ত।

সর্বেশ্বরবাবু আমাকে অপমান করেননি, কিন্তু লজ্জা দিয়েছেন। এটা স্বাভাবিক। চার চারটি মাস কেটে গেছে, ওঁকে আমি হাতে তুলে কিছুই দিইনি। অথচ দিতে হবে। ওকে দিতে হবে, আর দিতে হবে নিজেকে। এ বুভুক্ষু অন্তরকেও যে দিতে হবে কিছু! সেই চোখ তুলে তাকানো, সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি!—আমার মধ্যে সে কী দেখেছে, কে জানে! যাকে সে দেখেছে আমার মধ্যে, তাকেই তো দিতে হবে আমার মূল্য। 'মা, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী,'—একথা বলবার মতো যোগ্যতা আমাকে অর্জন করতেই হবে। সেই যে মোটরের কারখানায় কাজ করেছিলাম কিশোর বয়সে শেষ পর্যন্ত সেখানেও গিয়ে দেখা করেছিলাম পরিচিত মিস্ত্রীদের সঙ্গে। সেখানেও সেই এক উত্তর, কাজ কোথায়?

হেড-মিস্ত্রী, যার বিড়ি-সিগারেট-চা এনে দিতাম ছুটে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে, তাকেও ধরলাম। বললাম—যে কোনো কাজ—। আরও বৃদ্ধ হয়েছে সে, স্থবির। বললে—সারাজীবন শরীরের ওপর অত্যাচার করেছি, এখন শরীর তার শোধ নিচ্ছে। পিদ্দীম নিভে আসছে, এখন আমাকেই কে দেখবে জানি না, তার ওপর বলছ, তোমাকে দেখতে? মরা মানুষ কি কাউকে দেখতে পায় হে?

ফিরে এলাম। ঘুরলাম, ছোটখাট কতো কারখানায়, কতো দোকান-পত্তরে পর্যন্ত। কিন্তু, কোথায় কাজ? কাজ কোথায়?

এই ভাবে কেটে গেল তিরিশটি দিন, একটি মাস। ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছি, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে। আর, যতবার মন চেয়েছে সেই ওঁদের বাড়িতে যেতে, ততবার তীব্র আক্রোশে শাসন করেছি নিজেকে। বলেছি, যোগ্য হও, যোগ্য হও আগে।

শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনই আনল এক কাজের খবর। তাদের কাঠের কারখানার কাজ। কাজের চাপ পড়েছে, তাই দু মাসের জন্য

অস্থায়িভাবে তারা একজন লোক চাইছে, হিসেব-নিকেশ করতে হবে বসে বসে, চিঠি-পত্রও লিখতে হবে। মাস গেলে—প্রায় আশী টাকা পাওয়া যাবে। বেতনটা অবশ্য দৈনিক হিসাবে।

বৃন্দাবন বুঝিয়ে দিলে। বললে—তিনটাকা করে রোজ। ছাব্বিশ দিনে কতো হয়? ছাব্বিশ ইনটু তিন, হলো গিয়ে,—তিন-ছয়-আঠারোর—আট, তিন দুকুনে ছয় আর একে সাত—আটাত্তর। তা' আটাত্তর আর আশীতে তফাৎটা এমন কী?

আরও বললে বৃন্দাবন—পরে চাকরীটা পাকাও তো হতে পারে। তখন ঘরভাড়া করবে। বিয়ে করবে। বউ আনবে।

বউ!

অথচ, সুদক্ষিণার কথা বৃন্দাবনকে আমি বলিনি। বৃন্দাবন কেন, জগৎসংসারে কেউ তা জানে না। 'যে আছে অপেক্ষা করে, তার—পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদূর!' সে আমার একান্ত স্বপ্ন!

হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম বৃন্দাবনের। বললাম—তুমি যে আমার কী উপকার করলে!

—আবার!—মুহূর্তে ভ্রূকুটি জেগে উঠল ওর দুচোখে, বললে—তোমার কাছে টাকা পাবো, সেটা উশুল করতে হবে তো? তাই চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রীতিমত স্বার্থ আছে আমার!

যাই হোক, বৃন্দাবনের সঙ্গে পরদিন তার কারখানায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত কাজটা আমি পেলাম। যতোই অকিঞ্চিকর হোক তবু তো কাজ! এবং কোনো শর্ত ছিল না একাজের। কোনো বড়বাবুর খঞ্জ কন্যাকে বিবাহ করে ধন্য হবার প্রস্তাবও ছিল না এর সঙ্গে জড়িয়ে। তবে—

মালিক বললেন—কাজটা একেবারেই অস্থায়ী। তা হোক, লেগে যান আজ থেকেই।

বৃন্দাবন বললে—আমাদের 'রবিবার' নেই, তোমার কিন্তু 'রবিবার' আছে। রবিরার বেরতে হলে আশীর বেশী পেতে অবশ্য। কিন্তু, বাবু তা চাইছেন না।

যেদিন কাজ শুরু করলাম, তার পরের দিনটা ছিল সত্যিই রবিবার।

সকালে, চা-টা খেয়ে যখন রওনা হলাম, তখন রাস্তায় হাঁটছি, আর মনে হচ্ছে, যাইনি বহুদিন। বহুদিন শুনি নি অন্তরালবর্তিনীর সেই চুড়ির মৃদু সঙ্গীত, বহুদিন পাই নি পায়ের ওপর তার প্রণামের ছোঁয়াটুকু!

কিন্তু, হায়রে ভাগ্য, গিয়ে দেখি, স-ব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মা, বললেন—ওঁর চোখটা আরও খারাপ হয়েছে, ভালো দেখতে পান না, তাই ওঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তবু, পোড়া পেট কি মানে? উনি সকাল-সকাল গিয়ে বসছেন মায়ের মন্দিরে, পুজোপাঠ করছেন। তুমি আমার সঙ্গে একবার মন্দিরে চলো বাবা, ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে উনি খুবই দুঃখ পাবেন। ভুল করে তোমার মেস-এর ঠিকানাটা রাখা হয়নি। কতদিন উনি বেরিয়েছেন আন্দাজে আন্দাজে খুঁজে বার করতে। কিন্তু, পাবেন কী করে? তোমার ঠিকানাটা আজ রেখে যাও তো বাবা।

আমিও কিন্তু আশ্চর্য লোক, সহজভাবে সবকিছু শুনে চলেছি। একটা কাগজে ঠিকানা লিখে নিশ্চুপে ওঁর হাতেও তুলে দিয়েছি।

বললেন—আমারই ভুল। বারবার উনি বলেছেন—জামাইয়ের ঠিকানাটাও রাখতে পারোনি?

জামাই!

হ্যাঁ, সেই থেকে আমি ওঁদের জামাই। সুদক্ষিণা নাকি যাবার আগে করে গেছে আমার নাম। মাকে বলেও গেছে—মাগো, ওঁকে আর একটি বারও প্রণাম করতে পারলাম না!

প্রশ্ন করেছিলাম—কী হয়েছিল?

মা বললেন—প্রবল জ্বর। 'মাথা ছিঁড়ে পড়ছে—মাথা ছিঁড়ে পড়ছে' বলত। অতো কি বুঝতে পেরেছি বাবা! শেষের দিকে ওর

বাবা ভালো ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তার বললে—খুব খারাপ ধরনের টাইফয়েড। সাবধানে রাখতে হবে। তা' বাবা, সাবধানেই তো রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ধরে তাকে রাখতে পারলাম না!

মাথা নীচু করে নীরবেই সেদিন চলে এসেছিলাম। ওঁর সঙ্গে মন্দিরেও যেতে পারিনি অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসে, চুপচাপ শুয়েছিলাম আমার বিছানায়। কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে চিত্ত। দুঃখও নয়, বেদনাও নয়, আঘাতও নয়, প্রতিঘাতও নয়, যেন একটা পাথরের মন নিয়ে পড়ে আছি! এত বড়ো একটা ঘটনা, কিন্তু তেমন কোনো সাড়াই বুঝি জাগল না মনে!

বিকাল হতে-না-হতেই উঠে পড়লাম। মনে হ'লো, ঠিকানা দিয়ে এসেছি, যদি অতুলবাবু খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েন! যাকে নিয়ে সম্ভাব্য সম্পর্ক, সে-ই যখন রইল না, তখন মিছিমিছি আমাকে খুঁজতেই বা আসবেন কেন? তবু মনে হ'লো, যদি এসেই পড়েন!

বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। সেই রবিবারের কারখানা। মালিক নেই, খাতা-টাতা লেখার জন্য যে ছোট্ট ঘরটি রয়েছে সেটি তালাবন্ধ। বাইরে একটা বৈদ্যুতিক করাত চলেছে ঘস্‌ঘস্‌ করে, তার সামনে কাঠের খণ্ডগুলি সাজিয়ে রাখছে লোকেরা, আর তা দেখতে দেখতে কাটা হয়ে যাচ্ছে, নীচে জমা হচ্ছে রাশিরাশি কাঠের গুঁড়ো। হঠাৎ মনে হ'লো, কাঠের বদলে একটা জীবন্ত মানুষকে ঐ করাতের সামনে রাখলে কেমন হয়? করাতের হিংস্র দন্তপংক্তিগুলি কি স্তব্ধ হয়ে যাবে? বিদ্যুৎ কি থমকে থেমে যাবে সে দৃশ্য দেখে?

—পরমেশ!

চমকে চেয়ে দেখি, বৃন্দাবন কখন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে! বললে —এমন অ-দিনে, অ-ক্ষণে?

—এলাম।

বৃন্দাবন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল—চোখে জল কেন ?

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি হাত রাখলাম চোখের কাছে। রেখে, আমিও গেলাম অবাক হয়ে। নিজের অজ্ঞাতেও কি চোখের জল আসতে পারে মানুষের ?

বললাম—কাঠের গুঁড়ো লেগেছে বোধ হয়। এসো বৃন্দাবন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কী ?

সরে এলাম আমরা করাতের কাছটা থেকে। বললাম—কাছে-পিঠে একটা মেস্-টেস্ আমাকে খুঁজে দিতে পারো ভাই ! সম্ভব হলে আজই ?

বৃন্দাবন অবাক হয়ে বললে—কেন ? ম্যানেজার বলেছে কিছু ?

—না—না, সে-সব কিছু নয়। আমার আর ও-মেসে থাকতে ইচ্ছা করছে না একটুও।

—কেন বলো দেখি !

—সে অনেক কথা !

—তবু, বলোই না !

বললাম—আসল কথা, আমাদের ঘরটা কি অন্ধকার দেখেছ তো ?

বৃন্দাবন বললে—তা আমরা আছি কী করে ? তুমিই বা রইলে কি করে এতকাল ?

বললাম—ছিলাম কোনক্রমে। আজ আর পারছি না।

বৃন্দাবন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলো, তারপরে বললো—তুমাস চাকরি করার পর এটা করলে ভাল হ'তো না।

—না, ভাই। অপেক্ষা করতে আমি আর পারব না।

বড়োমিস্ত্রীর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি নিয়ে অগত্যা বৃন্দাবন বেরুলো আমার সঙ্গে।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা পাইস হোটেল বললেই হয়, তার ওপরতলায় একটা সীট পাওয়া গেল। বৃন্দাবন মাঝে মাঝে এখানে খেতো, সেই সূত্রে হোটেলের মালিকের সঙ্গে একটু আলাপও ছিল। বললাম—বেশ হয়েছে। এই আমি বসে রইলাম সীটের জায়গায়। তুমি কারখানার পর ও-মেসে গিয়ে আমার বিছানা আর স্যুটকেসটা এনে দেবে। ব্যস্।

বৃন্দাবন কী ভেবে, একটু হেসে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বললে—ব্যাপারটা বুঝেছি। ও-মেসের ম্যানেজারকে বাকী টাকার দরুন কলা দেখাতে চাও—তাই না ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—ছি-ছি, একেবারেই না। বরং চলো, তোমার সঙ্গে কারখানায় ফিরে যাচ্ছি, ওখানে বসে, তোমার হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেবো ম্যানেজারের নামে, ঠিকানা দিয়ে। মাসে মাসে, কিস্তিতে-কিস্তিতে আমি শোধ করবো ওর টাকা। কখনই টাকা মারব না !

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বৃন্দাবন।

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, বৃন্দাবনের মন খারাপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, আমি মেস্-বদল করলাম। পুরানো ম্যানেজার বিশ্বাস করেছিল আমার কথা, আমার চিঠি পেয়ে। বিছানা-স্যুটকেস নতুন জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বৃন্দাবন বলেছিল—কাজটা কিন্তু ভালো করলে না ভাই পরমেশ !

চুপ করে রইলাম। কারখানায় তো রোজই দেখা হয় বৃন্দাবনের সঙ্গে। রোজই জিজ্ঞাসা করি ওকে চুপিচুপি,—হ্যাঁ, ভাই, কেউ আমাকে খুঁজতে এসেছিল ?

—কই, না ?

—একটু খোঁজ নিও তো ? কেউ আসে কি না ?

বৃন্দাবন বললে—ব্যাপারটা কী ?

—তেমন কিছু নয়।

বৃন্দাবন বললে—আজকালকার দিনে মানুষ মানুষকে সচরাচর প্রাণ খুলে কোনো কথা বলে না। ব'লে লাভও নেই। আমি শুনতেও চাইছি না। কিন্তু একটা ব্যাপারের আঁচ পাচ্ছি যে?

—কী?

বৃন্দাবন চোখ মটকে হাসতে-হাসতে বললে—এইজন্যই মেস্ পালালে?

—কী জন্য?

সেইভাবেই বললে বৃন্দাবন—পাওনাদার ঠেকাচ্ছ বুঝি?

—না ভাই।

আমার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে, বৃন্দাবন আরও উৎসুক হ'লো, বললে—তবে?

অল্প একটু হেসে বললাম—আজকালকার দিনে মানুষ মানুষকে সচরাচর প্রাণ খুলে কোনো কথা বলে না, ব'লে লাভও নেই।

বিরস মুখে বৃন্দাবন বললে—তা বটে।

বললাম—কিন্তু সব কথা আমি একদিন তোমাকে বলব বৃন্দাবন। সংসারে একমাত্র তোমাকেই আমি তা বলতে পারি। তবে, আজ নয়, পরে একদিন শুনো ভাই।

—বেশ।

—শুধু এইটুকু সন্ধান নিও, আমাকে কেউ খুঁজতে আসেন কি না।

—আচ্ছা।

পরদিন। আমি জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলে উঠল বৃন্দাবন—না, কাল কেউ আসেনি। তারও পরদিন বৃন্দাবনের মুখে সেই একই কথা।

বললাম—থাক ভাই। আর তুমি খোঁজ নিও না।

—সে কী! কেন?

বললাম—আমারই ভুল হয়েছিল। কেউ আসবে না খুঁজতে।

কিন্তু তার পরের দিন ঘটল অন্য এক ঘটনা। বৃন্দাবন বললে—কেউ খুঁজতে আসেনি। তবে একটা চিঠি এসেছে তোমার। এই নাও।

খামে মোড়া চিঠি। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, চিঠি এসেছে সীমাচলম্ থেকে। লিখেছে খাঁদু, সেই শশীশেখর চক্রবর্তী।

"বিশ্বসংসারে আমার কেউ নেই বলে জানতাম। কিন্তু, তুই এসে ওলট-পালট করে দিলি সব। তাই তোকেই চিঠি লিখছি, আর, এই আমার শেষ চিঠি কি না, কে তা বলতে পারে।"

পড়তে পড়তে মুখ তুললাম। সেই যে এসে ওকে চিঠি দিয়েছিলাম, তারপর ওকে আর কোনো পত্র দিইনি। অথচ উচিত ছিল। উচিত ছিল লেখা "আমি একটা কাজ পেয়েছি খাঁদু, এইবার তোকে আমি আমার কাছে এনে রাখতে চাই। তুই ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে আয়। আমার যদি একমুঠো জোটে, তোরও জুটবে।"

কিন্তু, অতুলবাবুর কাছে 'যাওয়া উচিত' মনে করেও যাই যাই করে শেষ পর্যন্ত গেলাম এমনই এক মুহূর্তে, যখন সব আমি হারিয়ে বসে আছি! আর, এই 'উচিত'-এর সাড়া দিতে-দিতেও কি আমার অভাবিত দেরি হয়ে গেল?

খাঁদু লিখেছে,—"সীমাচলমে মনিবের সঙ্গে এবার একদিন উঠতে উঠতে যখন মার কাছে ক্লান্ত হয়ে এসে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছি, তখন হঠাৎ মুখ দিয়ে উঠল রক্ত। এক আধ ফোঁটা নয়, ঝলকে-ঝলকে রক্ত, মনে হচ্ছিল, শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্তও বুঝি এ-রক্তপাত বন্ধ হবে না! ভিড় জমে গেল চারিদিকে, সীমাচলম্-মন্দিরের দৈনন্দিন ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার!

মা আমাকে লোকজনের সাহায্য নিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেল তার ঘরে। এবং সেই যে নিয়ে গেল, সেই থেকে তার ঘরেই আছি। পাহাড়ের ওপরে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে দেখতে পাই, ধাপে-ধাপে নেমে গেছে আনারসের ক্ষেত। আর কোনক্রমে কোনদিন যদি দরজার কাছ পর্যন্ত এসে দাঁড়াতে পারি, তো দেখি, সামনেই আরও উঁচু হয়ে

গেছে পাহাড়, সেখানে আর আশে-পাশে কাজুবাদামের গাছ লাগানো রয়েছে। মায়ের ঘরের সীমানায় নয়, ও জমি আর গাছ ইজারাদারের।

মনিব কিন্তু আমার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। সেই যে রক্তপাতের সময় কার হাতে যেন দশটাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়েছিল, ব্যস, সেই-ই শেষ। আমার রক্ত-জল-করা-খাটুনীর দরুন এ মাসের মাইনেটাও পাঠায়নি। শুধু বলে গেছে, 'বাবুজীকে ব'লো, যদি বাঁচে, তো, আমার চাকরিতে আর তাকে যেতে হবে না। বাবুজীর দেখছি খারাপ অসুখ। আমি অন্য লোক নেবো।'

কিন্তু, আশ্চর্য এই বিদেশিনী। এ যে নিজে কতো গরীব, তা আমার আগে জানা ছিল না। অথচ, সেই অবস্থাতেও সে মাথায় করে নিয়েছে এই রোগীর ভার। ফলে, তাকে যে কী বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা আর বলার নয়! সীমাচলম্ অঞ্চলের সবাই কানাঘুষা করছে এ ঘটনা নিয়ে, এবং মায়ের যে পূজোর ফুল-ফল-বিক্রীর দোকানটা ছিল, সেটা উঠে যাবার উপক্রম! কলঙ্কিনীর হাতের ছোঁয়া ফুলে-ফলে কি দেবতার পূজা হয়?

শরীর একেবারে অশক্ত। দু'দিন ধরে বসে বসে তোকে এই চিঠি লিখেছি। জানি না, এ-চিঠি সময় মতো পোস্ট করা যাবে কি না। মা তো আমাকে ছেড়ে নামতে পারে না। ভরসা কেবল ওর সেই বুড়ী মাসী। দোকানের ভার তার ওপর, কিন্তু সে জরাগ্রস্ত মানুষ, ভালো চোখে পর্যন্ত দেখে না, সে কাজকর্ম চালাবে কেমন করে?

তবু, দিন চলছে। সূর্য উঠছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। না, হাবুল, জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। শুয়ে-শুয়ে এই কথাই ক্রমাগত ভাবছি, যা পাইনি, তা পেলে কেমন হ'তো? পেলে যে সেটাই খুব বড়ো পাওনা হ'তো জীবনে, তা-ও তো মনে হয় না! ছোটবেলায় পাঠ্য বইয়ে কত-কীই তো পড়তে হয়েছিল, তার মধ্যে কোনো এক কবির একটা কবিতার একটি লাইন বড়ো বেশী মনে পড়ছে

—'We will receive good from the hand of God, evil not receive ?'

লিখে-লিখে কদিনে শেষ করবো এই চিঠি? তাই এখানেই থামলাম। কী জানি কেন, তোকে আজকাল বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। কেমন আছিস? ইতি—"

বৃন্দাবন আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। বললে—কোনো দুঃসংবাদ নয় তো?

চিঠিটা মুড়ে খামে ভরে পকেটে রেখে দিলাম সযত্নে, তারপরে বৃন্দাবনকে বললাম,—তোমার সেই টাকা আজও সব শোধ করতে পারিনি, তবু তোমাকেই বলছি, কিছু টাকা ধার দিতে পারো? আজই? এখখুনি?

—পাগল! টাকা দেবো কোত্থেকে! কিন্তু ব্যাপারটা কী?

বললাম—আমার সেই ভাই মৃত্যুশয্যায়। আমাকে সীমাচলম্ যেতে হবে। আজ না হয়, কাল। পঞ্চাশটি টাকার দরকার। হাতে একটিও পয়সা নেই।

বৃন্দাবন আমাকে ধরে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। দুজনে মিলে অনেক পরামর্শ করে স্থির করলাম, মনিবের কাছ থেকে ছুটি তো চাইতেই হবে, সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা অ্যাডভান্স্ চাইবো।

গেল আমাকে নিয়ে বৃন্দাবন মনিবের কাছে। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন! একটা মাসও কাজ হয়নি, এর মধ্যে ছুটি কী!

আর টাকা? 'কাজ নেই, বেতনও নেই',—এই শর্ত যখন কাজের, তখন হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ টাকা পাওনাও হয়নি এ-যাবৎ। অগ্রিম টাকা দাবী করি কি করে?

বৃন্দাবন তবুও নিরুদ্যম হ'লো না। সেদিনটা গেল; পরদিন ছুটি হবার আগে, অনেক বলে কয়ে পঞ্চাশটাকা মনিবের কাছ থেকে যোগাড় করে দিলে। বললে—নাও, আমাকে আবার জামিন দাঁড়াতে হ'লো। তা হোক, তুমি বেরিয়ে পড়ো।

সেদিন আর ট্রেন নেই। রওনা হলাম পরদিন। তারও পরবর্তী দিবসে পৌঁছে, সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে, খোঁজ খবর করতে করতে যখন পাহাড়ের আরও ওপরে, সেই বিদেশিনী মহিলার কুটিরের দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন মনে হ'লো এতদূর থেকে উর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে এসে শেষ পর্যন্ত লাভ হ'লো না কিছুই। তা'ছাড়া, খাঁতু আমার এমন কী নিকট আত্মীয়, যে, তার জন্য এমন করে নিতান্ত আবেগের বশেই ছুটে এলাম? যদি সে সত্যিই আমার একান্ত আপন কেউ হ'তো, তো, এইভাবে আমার আসার আগেই কি চলে যেতে পারত? খবরটা শুনে আমার প্রথমটায় দুঃখ হয়নি, শোক হয়নি, হয়েছিল রাগ। মনে হচ্ছিল, কী অধিকার ছিল ওর এমনভাবে আমাকে নিরাশ করবার?

মহিলাটির বুড়ী-মাসীকে গেয়েছিলাম সেই ফুল-ফল বিক্রী করবার দোকানে। আন্দাজে আন্দাজে ভাব-বিনিময় করে তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি বাঙালীবাবু, কলকাতা থেকে আসছি। যে বাঙালীবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে দেখতে এসেছি। বুড়ী কী বুঝেছিলো কে জানে, পাশের মেয়েটিকে দোকান দেখতে বলে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো এখানে। সেই তখনই যদি বলতো যে, খাঁতু আর ইহজগতে নেই, তাহলে কষ্ট করে এতটা পথ ভেঙে আমি ওপরে উঠতামই না!

খাঁতুর সেই স্বল্পবয়সী 'মা' দরজার কাছেই বসেছিল একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরস্তূপের মতোই। আমাকে দেখে কী যে সে বললে বুঝলাম না, কিন্তু তার চোখের কোল বেয়ে যে ধারা নামলো ঝরঝর করে, তার ভাষাও কি আমি পারব না বুঝতে?

ধপ্ করে বসে পড়েছি তার নীচু ঘরটার দাওয়ার ওপরে। বুড়ী ইতিমধ্যে নীচে নেমে বুড়োমতন একটি লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। লোকটি কাঠকুটো কাটে, কি ঐ ধরনের কোনো শ্রমজীবির কাজ করে বলে মনে হ'লো। ভাঙা-ভাঙা হিন্দী জানে সে। কথা-

বার্তার সুবিধা হবে বলে বুড়ি তাকে বুদ্ধি করে নিয়ে এসেছে। তার মাধ্যমে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম, খাঁতু গেছে মাত্র কাল। বুকের পাঁজরে আর কিছু ছিল না। রাজযক্ষ্মা রোগ। ভালো-মতো না খেয়ে আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে এই হয়েছে আর কী! চিঠি লিখেছিল একটু-একটু করে। সব সময়ই বুঝি আমার নাম করতো। বলতো, একটু ভালো হয়েই সে কলকাতায় চলে যাবে, আর আমার কাছে থাকবে।

মেয়েটি চোখ মুছে এক সময় বললে—বাবুজী, শ্মশানে যাবে একবার?

মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে, তারপর বললাম—না।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে, তুমি হাত-পা ধুয়ে নাও বাবুজী, পরে, কাছেই মন্দিরের কুণ্ড, সেখানে চান ক'রো। মন্দির থেকে ভোগ আনিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রো।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—না। আমি এখুনি ফিরব। তবে, তার শেষ সময়ে তুমি যা করেছ, তার জন্য আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার ঋণ শোধ করা যায় না, তবু, আমি গরীব, আমি টাকাটা রাখছি, হাতে করে নিও।

বলে, দশ টাকার একখানা নোট দাওয়ার ওপর নামিয়ে রেখে, আর কোনোদিকে না তাকিয়ে একেবারে ছুটে ওখান থেকে চলে এলাম বলা যায়।

চলে এলাম বটে, কিন্তু খাঁতুর 'কুমারী' মায়ের দান যে সত্যিসত্যি কতখানি, তা জানতেই পারতাম না, যদি না হঠাৎ আমার দেখা হয়ে যেতো সেই পাণ্ডাঠাকুরটির সঙ্গে। সীমাচলমে নেমেই দেখা করার ইচ্ছা ছিলো তাঁর সঙ্গে; স্টেশনে যেন যাত্রীর জন্য ঘুরছে, এমনও একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি যদি কারুর সঙ্গ কৌশলে পরিহার করতে চাই, তাহলে তার পক্ষে আমার সাক্ষাৎ পাওয়া তেমন সহজ হয়ে ওঠে কী?

আমি পাণ্ডাঠাকুরটির কাছ থেকে তখন পালিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, দেখা হওয়া মাত্রই তো সে জিজ্ঞাসা করবে অতুলবাবুর কথা। হয়তো সুদক্ষিণার কথাও জিজ্ঞাসা করে বসতে পারে! কী উত্তর দেবো আমি তাকে? এটা ভেবেই আমি দূরে যেতে চেয়েছিলাম পাণ্ডাঠাকুরটির কাছ থেকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা গেল কই? সিঁড়ির ঠিক নীচে, হঠাৎ দেখা। বললে—আরে, বাবুজী না?

নিয়ে গেল ধরে ওর বাড়ি। সরোবরের তীরে সেই মাটির ঘরখানি। ভিতর থেকে মাতুর আর চাদর আর বালিস নিয়ে পেতে দিলে। তারপরে, স্নান, আহার, কোনটাই বাদ গেল না। যে-কথা তুলতে চাইনি, সেই কথাই উঠে পড়ল আগে। কেমন আছেন অতুলবাবু?

দিলাম সে দুঃসংবাদ। সুদক্ষিণা নেই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো পাণ্ডাঠাকুর। তারপরে উঠলো অন্য প্রসঙ্গ। দেখা গেল, খাঁতুর মৃত্যুসংবাদ-সম্পর্কীয় যাবতীয় কথাই সে জানে। বললে ঐ মেয়েছেলেটিকে দেখে এলেন?

—হ্যাঁ।

—ওকে নিয়ে নানান কথা উঠেছে বাবুজী।

—কেন?

পাণ্ডাঠাকুর বললে—দোষণীয় কোনো সম্পর্ক ছিল না, এ আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু, মানুষের মন, বোঝো তো? অমন রোগী, যাকে ভয়ে কেউ ছুঁতে চাইল না, তাকে নিয়ে তুলল নিজের ঘরে। লোকে কাণাঘুষো করবেই। মেয়েটিকে একঘরে করা হয়েছে।

পাণ্ডাঠাকুরটি থেমে থেকে আবার বললে—মেয়েটির ভবিষ্যৎ কী, কে জানে! বিয়ে ওর আর হবে না। মন্দিরের ফুল-ফল যে বিক্রী করবে, এ-ও চলবে না। আমি গিয়ে বললাম—কমলা, এর পর করবি কি তুই?

—নাম বুঝি কমলা ?

—হ্যাঁ—পাণ্ডাঠাকুর বললে—কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে অদ্ভুতভাবে। বললে—ঠাকুরমশাই, সে কথা ভাববেন না। একটা মানুষ, চলে যাবেই এক রকম করে। ভেবে দেখুন বাবুজী, এরকম বদনাম যে উঠতে পারে, এটা জেনেশুনেই ও ঐ বাঙালীবাবুকে নিয়ে গিয়ে ঘরে তোলে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এতটা যে করলি, ও তোর কে ? তা বললে কি জানেন ? বললে—ও আমার সন্তান।

—দূর পাগলী !—হেসে বলেছিলাম—বয়সে ও যে তোর থেকে বড়োই হবে। সন্তান কেমন করে হবে ?

তা বললে—জন্মান্তর মানো তো ঠাকুরমশাই ? ও আমার আর জন্মের ছেলে।

ওর ওপর আর কথা চলে না। কত জনে কত কথা বলেছে, কারুর কথা ও শোনেনি। প্রাণপণে সেবা করেছে, নীচে এসে, হাতে-পায়ে ধরে কবিরাজ নিয়ে গেছে, ডাক্তার নিয়ে গেছে। নিজের যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব খুইয়েছে। ওকে মদনাপল্লী পাঠাবে, সব ঠিকঠাক, কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল !

শুনতে-শুনতে আমার চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল। পাণ্ডাঠাকুরটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কী হ'লো বাবুজী ?

—কিছু না।—বললাম,—রোদ তো পড়ে এসেছে। আমি আরেকবার ওপরে যাবো, দেখে আসব তাঁকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পাণ্ডাঠাকুরটি বললে—বেশ, চলুন, আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

গেলাম। কমলা বললেন—তোমার দশটা টাকা আমি নিলাম বাবুজী। বামুনের ছেলে গেছে, শ্রাদ্ধশান্তিও তো যা হোক কিছু করার দরকার। ও দশ টাকা তখন হাজার টাকার কাজ করবে।

লজ্জিত হলাম একটু, বললাম—আমার অবস্থাও ভালো না। নইলে—

কমলা বললেন—ওসব ভেবো না। তোমার কথা সব সময় সে

বলত। ভালবাসত তোমাকে। তোমার টাকা ওর শেষ কাজে লাগছে, এতে ওর আত্মা তৃপ্তিই পাবে।

কিছুক্ষণ ছিলাম বসে ওঁর কাছে, দাওয়ার ওপর। বললাম—যা শুনলাম, এখানে তো আর তোমার থাকা হয় না। যাবে কোথায় একা মানুষ তুমি?

ম্লান হাসল, বললো,—দেখি। শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত তো আমাকে থাকতেই হবে। তারপরে কোথাও স্থান না পাই, বৃন্দাবন তো আছেই। সেখান থেকে কেউ আমাকে তাড়াতে পারবে না।

কথা হচ্ছিল সমস্তই পাণ্ডাঠাকুরের মাধ্যমে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম এবার—এখানে যাতে ও থাকতে পারে, সে ব্যবস্থা তুমি করতে পারো না?

—সসম্মানে থাকা মুশকিল! তবে, আমি চেষ্টা করছি কমলাকে রাখবার।—পাণ্ডাঠাকুর বললে—কিন্তু, ওর মনও টলে গেছে। বৃন্দাবনই এখন ওর স্থান। দেখছ না উচ্চভাব? নইলে, তুচ্ছ এক বিদেশী মানুষের জন্য ওরকম কেউ করতে পারে।

বললাম—আচ্ছা, আমি তো ওর ভাই ছিলাম, আমার সঙ্গে তুমি কলকাতায় চলো না কেন? কমলা এবারও ম্লান হাসল, বলল,—আমার সম্বন্ধে তোমার এত ভাবনা কেন বাবুজী? যিনি আমার এ অবস্থা ঘটিয়েছেন, তিনিই করে রেখেছেন আমার সব ব্যবস্থা। তোমরা মাঝখানে এসে এত কোলাহল তুলছ কেন?

পাণ্ডাঠাকুর আমার দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন—কেমন, বলেছিলাম না?

আর কোনো কথা বলিনি। সেই আশ্চর্য শান্ত প্রতিমাটির কাছ থেকে আমরা দুজনে নীরবেই উঠে চলে এসেছিলাম।

এরপর, আবার কলকাতা। সেই কাঠের কারখানা, আর সেই আমার নতুন মেস্। বৃন্দাবনের মুখখানা থমথম করছে• অস্বাভাবিক

গাম্ভীর্যে। দিনের শেষে, ফেরার মুখে, ওকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে!

—কীসের কী হয়েছে?

—অতো গম্ভীর কেন?

বৃন্দাবন বললে—তার আগে বলো, তোমার খবর কী?

বললাম সব। ও শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপরে এক সময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তোমার ভাগ্যটাই দেখছি খারাপ।

বললাম—আমার মতো দরিদ্রদের মধ্যে কার ভাগ্যটাই বা ভালো?

বৃন্দাবন বললে—সে তো ঠিক কথা। কিন্তু, এদিকে কী হয়েছে জানো?

—কী?

বৃন্দাবন চুপিচুপি বললে—তুমি ছুটি নিয়েছ, অ্যাডভান্স নিয়েছ, বাবুর তা পছন্দ হয়নি। আমাকে ডেকে বললে—একমাস কাজ হতে-না-হতেই যে ছুটি নেয় আর অগ্রিম মাইনে নেয়, তার দ্বারা কাজ চলতে পারে না। এমাসের শেষেই আমি অন্য লোক নিচ্ছি। তুমিই ওকে এনেছ, তুমিই ওকে বলে দিও। এই মাসটা অবশ্য খাটুক, নইলে আমার টাকাটা উশুল হবে কি করে?

শোনামাত্র বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল যেন!

বৃন্দাবন বললে—এ নিয়ে উচ্চবাচ্য ক'রো না, ভিতরে ভিতরে কাজ খুঁজতে শুরু করে দাও।

সত্যি কথা বলতে কী, সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে যেন বিভীষিকা দেখতে শুরু করেছিলাম। কখনো বুকের ভিতরটা গুমরে-গুমরে উঠছে, কখনো হাত দিয়ে মুচছি চোখের জল, আবার কখনো তীব্র অভিমান এসে চিত্তকে অধিকার করছে। কখনো হচ্ছে প্রচণ্ড রাগ। মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে যখন এসেছি তখন আমার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই কেন?

পর মুহূর্তে ভিতরে গর্জে উঠছে আরেক মন,—কে বললে অধিকার নেই বেঁচে থাকবার? ছিনিয়ে নাও তোমার অধিকার। আঘাত যদি পাও, প্রতিঘাত করো।

কিন্তু, করবো কাকে প্রতিঘাত? প্রতিপক্ষ কি একজন? অস্ত্র কি তাদের এক ধরনের? এই সব নানান রকম ভাবতে ভাবতে এক সময় মনটা যখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, তখন যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তিনটি ফুল নিয়ে গাঁথা একখানি ঘটনার মালা! সুদক্ষিণার মৃত্যু, খাঁতুর চলে যাওয়া, আর এই চাকরির দুঃসংবাদ, সব যেন একটি আশ্চর্য সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে, আর আমাকে তা ঠেলে দিচ্ছে ক্রমাগত এক অদ্ভুত—অনিবার্য পরিণতির দিকে!

শেষ রাত্রের দিকে, ক্লান্ত শরীরে যখন শেষ পর্যন্ত ঘুম নেমেই এলো, তখন স্থির করে ফেলেছি, গিয়ে দেখা করবো সেই সোমেশ্বর-প্রসাদের সঙ্গে। বলবো, সেই সুযোগ কি এখনো আছে? আমি তাহলে রাজী কৃষ্ণবর্ণা খঞ্জ মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী করে জীবনযুদ্ধে নূতন করে পুনর্বার নেমে পড়ায়।

পরদিন সকালে স্বভাবতই ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেলো। আরও একটু ঘুমোতাম যদি মেসের ঠাকুর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি না করতো। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, বিছানার পাশে, ঠাকুরটি একা দাঁড়িয়ে নেই, সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন আরেকটি মানুষ। শীর্ণকায় চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনের ধুতিটা খাটো—হাঁটুর কাছে গিঁট-বাঁধা, পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই, একটা ছেঁড়া আধময়লা নামাবলী। চোখে সেই পুরু কাচের চশমাটা শোভা পাচ্ছে। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—এ কী চেহারা হয়ে গেছে আপনার?

জ্বরে পড়েছিলাম বাবা!—অতুলবাবু বললেন—আজ উঠে তোমার সেই পুরনো মেস্-এ গিয়েছিলাম। তারাই তো ঠিকানাটা দিয়ে দিলে। যাক, খুঁজেপেতে পেয়েছি শেষ পর্যন্ত।

অদ্ভূত স্নেহমণ্ডিত সেই মুখখানি, বললেন—জামাই! কেমন

আছো? এসো একদিন। বুড়ী তোমায় না দেখে থাকতে পারে না! এই দেখ, তোমার জন্য একটু মায়ের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছে।

শালপাতার ছোট্ট ঠোঙায় দুটি প্যাঁড়া সন্দেশ।

সেদিন, ছুটির পর, সোমেশ্বরপ্রসাদের ওখানে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু যাওয়া হ'লো না।

এরপর থেকে প্রায়ই আসতেন বৃদ্ধ সেই কালীঘাট থেকে এতটা পথ হেঁটে। এবং প্রতিদিনই, কিছু না কিছু হাতে নিয়ে। বলতেন—জামাই, তোমার জন্য বুড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে; যাবে না বাবা একদিন? ওঁর পীড়াপীড়িতে গেলাম শেষ পর্যন্ত, কারখানার কাজ সেরে। গিয়ে মনে হ'লো, বৃদ্ধা যেন স্বর্গ পেয়েছেন হাতে। কোথায় আমাকে বসাবেন, কী আমাকে খাওয়াবেন, এ যেন ভেবেই ঠিক করতে পারছেন না তিনি! বসে আছি সেই ঘরে। বৃদ্ধ আহ্নিক সারতে গেছেন গঙ্গার ধারে, এখনো ফেরেন নি। বৃদ্ধা বাইরে কার ঘরে কী যেন চাইতে গেছেন মনে হলো। আর মনে হলো, ঘরের দরজাটা আপনিই যেন একবার নড়ে উঠলো, এইমাত্র কে যেন ঘরের ভিতরে এসে আমার পায়ে তার দুটি কোমল হাত ছুঁইয়ে নীরবেই রেখে যাবে তার একান্ত প্রণামটুকু!

ফিরে এলেন বৃদ্ধা। তারপরে দুজনে পরামর্শ করে কী যেন স্থির করলেন, কোথা থেকে কী-সব যোগাড় করে পায়েস রেঁধে যত্ন করে খাওয়ালেন আমাকে। ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিলাম ভয়ানক। মনে হচ্ছিল, এত স্নেহ বুঝি আমার মায়ের কাছেও পাইনি। কিন্তু, এত স্নেহ আমার কি সইবে, না, সইতে পারে? এরকম এক-আধবার নয়, অনেকবার। প্রায়ই মেসে আসতেন বৃদ্ধ—কেমন আছ জামাই? বুড়ী তোমাকে অনেকদিন দেখে নি, একবার এসো, কেমন?

এ দিকে মাস আসছে শেষ হয়ে। বৃন্দাবনের সঙ্গে গিয়ে মনিবকে ধরেও ছিলাম। বললেন—আর মরণকালে হরিনাম করে কী হবে—লোক ঠিক হয়ে আছে। আমার এক বন্ধুর ভাই, বি-এ পাস, পয়লা

থেকে কাজে লাগবে।

চিন্তায়-চিন্তায় পাগল হবার উপক্রম। এক ভরসা আছে, সোমেশ্বরপ্রসাদ। কিন্তু, কতবার মন স্থির করেছি, তবু পারিনি শেষ পর্যন্ত যেতে। অতুলবাবুর ঐ 'জামাই' ডাক, আমার সব-কিছু স্থিরতাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

আরও একদিন গিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ি। কী ভেবে যে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম জানি না। যেন কী এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করছিল। কানে বাজছিল অতুলবাবুর সেই সস্নেহ কণ্ঠস্বর,—বুড়ী তোমাকে অনেকদিন দেখে নি, একবার এসো, কেমন?

গেলাম। এবং সেই যে হবে আমার ওখানে শেষ যাওয়া, সে-ও বোধহয় ধারণা করতে পারিনি আগে।

বাড়ির অন্যান্য ঘরের বাসিন্দারা কে আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিল জানি না। তাদের কথা কোনোদিন ভাবি নি, আজও ভাবলাম না। একের পর এক ঘর পার হতে হতে কতো উৎসুক মুখ যে আমার দিকে বিস্ময়াবিষ্টের মতো দৃক্‌পাত করছিল, তারও হিসাব আমি আজ দিতে পারব না। ওঁদের ঘরের সেই দাওয়ার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন মনে হলো, আমাকে দেখে একটি ছায়ামূর্তি যেন যুগপৎ আনন্দ আর লজ্জায় দ্রুতপায়ে চলে গেল ঘরের ভিতরে, যেন নিম্নস্বরে বলেও উঠল—মাগো, কে আসছে দেখ?

জামাই!

কতোবার তো দেখেছি, মুখ তুলে দেখতে গিয়ে মনে হলো, নূতন যেন দেখছি ওঁকে! আচ্ছা, সব মায়ের মধ্যেই কি আমার মা এমন করে আত্মগোপন করে থাকে? শীর্ণতর হয়েছে চেহারা, চোখের নীচে ক্লিষ্টতার চিহ্ন, তবু, কী অপরূপ খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে ওঁর চোখদুটি, আমার পরীক্ষায়-পাস-করার সংবাদ শুনে আমার মায়ের মুখ-চোখের ভাব যেমন হয়ে উঠত, ঠিক তেমনটি!

কাছে আসতেই প্রণাম করলাম হাত বাড়িয়ে। উনি সঙ্গে সঙ্গে

হাত দুটি ধরে ফেললেন আমার। বললেন—এসো বাবা, ঘরে এসো, উনি এখুনি আসবেন।

নীরবেই উঠে এলাম ঘরে। যেখানে এসে বসতাম, ঠিক সেখানে বসলাম আজও। নিজের অজ্ঞাতসারেই বারবার দৃষ্টি যেতে লাগল দরজার আড়ালের দিকে।

আমাকে বসিয়ে রেখে উনি গেলেন বাইরে। জানি, উনি কেন গেলেন। এবং সেটা জেনে, যেন মরমে মরে গেলাম। শূন্য ঘরখানার দিকে তাকিয়ে দেখি, জিনিসপত্র বলতে যা দেখতাম, তা বহুলাংশে কমে গেছে। এই হালকা, নড়বড়ে তক্তপোষটি ছাড়া আসবাব বলতে আর কিছু নেই। একটা টুল ছিল, ছোট্ট একটা টেবিলের মতোও ছিল মনে পড়ছে—যার ওপর খানকতক বই আর খাতাপত্র সাজিয়ে রাখত সুদক্ষিণা; শুভ্রবরণী ছোট্ট একটি সরস্বতী-মূর্তিও লক্ষ্য করেছিলাম, মনে পড়ে। কিন্তু, আজ আর নেই সে-সব। ঐ যে ওপাশে একটা জলচৌকির ওপরে, ওপর-ওপর কয়েকটা ট্রাঙ্ক আর বাক্স সাজানো থাকত, তাও নেই। তার বদলে দুখানা ইটের ওপর একটা তক্তা বসানো আছে, সেই তক্তার ওপরে, একটা বড়ো পুঁটুলী। বেড়ার পাশে-পাশে যে ঝক্‌ঝকে পিতলের বাসনগুলি সাজানো থাকত, তারাও নেই। এ যে কিসের ইঙ্গিত, তা কি বুঝতে পারা আমার পক্ষে কঠিন? শেষের দিকে মাকেও যে এই কাজ করতে হয়েছে। থানকাপড়টার আঁচলে লুকিয়ে থালা নিয়ে কতবার যেতে হয়েছে মাকে আশে-পাশের বাড়ীতে। বাবা যে পুরনো শক্ত আর বাহারে কাঠের পিঁড়িতে বসে ভাত খেতো, একদিন সেটা পর্যন্ত বিক্রী করে দিতে হয়েছিল মাকে। অমন যে মা, যাকে ভেঙে পড়তে সহসা কেউ কোনোদিন দেখেনি, সে-ও সেদিন আমার সামনে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠেছিল।

—জামাই!

চমক ভাঙল ওঁর কণ্ঠস্বরে। একটি আসন কোথা থেকে চেয়ে

নিয়ে এসে পেতে দিয়েছেন মেঝের একপাশে, তার সামনে এক গ্লাশ জল, আর একটি ছোট কলাপাতা। তাতে কিছু কাটা ফল, কিছু ভিজানো মুগ, একটু গুড়, আর কয়েকটি নারকেল নাড়ু।

মুখে সেই সস্নেহ হাসি, বললেন—এসো বাবা, একটু মুখে দাও। এ-ও প্রসাদ বাবা।

কোনো কথা বলবার সামর্থ্য আমার ছিল না সেই মুহূর্তে। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে বসলাম যথাস্থানে, নিশ্চুপে! উনি কাছে বসেছেন একটি ছেঁড়া তালপাতার পাখা নিয়ে। আমি মুখ নীচু করে খেয়ে যাচ্ছি, আর উনি ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছেন কতো-কি কথা। আমার মায়ের কথা জানতে চাইছেন, বাবার কথা জানতে চাইছেন, আমি 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করে কোনক্রমে সাড়া দিয়ে যাচ্ছি। এক-একবার মনে হচ্ছে, কেন এলাম আমি, কেন এলাম?

—তোমাকে যত্ন করবার কেউ নেই, কণ্ঠার হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে, চোখদুটো বসে গেছে।—উনি বলে চলেছেন—সময় পেলেই এসো বাবা, রোজ-রোজ অন্ততঃ একবার করে এসো, কেমন?

শুনে, বুকের ভিতরটা যেন হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল।

খাওয়া হ'লো, উঠে আবার বসলাম পূর্বের স্থানে, তক্তপোষের একটি ধারে। এমন সময় এসে পড়লেন অতুলবাবু, আরও শীর্ণ তাঁর চেহারা, আরও জীর্ণ তাঁর বেশবাস। জীর্ণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন। যেটুকু আছে, যা আছে, তা নিয়ে যেন যত্নের আর শেষ নেই। এর পিছনে যাঁর অদৃশ্য হাত বিরাজ করছে, তিনি আমারই কাছে আছেন দাঁড়িয়ে, তালপাতার পাখা হাতে করে।

আমাকে দেখে, খুশিতে ভরে উঠল ওঁর মুখ। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই, হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করলেন আমাকে, বললেন—বটবৃক্ষের মতো হও, তোমার ছাওয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুক সবাই।

তারপরে, ঘরে এসে বসবার পর বলতে লাগলেন—কথাটা বড়ো ভালো, না বাবা? সেই যে সীমাচলমে গিয়েছিলাম? সেই পাণ্ডা-

ঠাকুরটিকে তো নিশ্চয়ই মনে আছে? তার কাছেই শিখেছিলাম। তাদের রীতিনীতিতে ওটা সব থেকে বড়ো আশীর্বাদ। ভেবে দেখলাম, সত্যি কথাই। বট বনস্পতি, এবং দেয় স্নিগ্ধ ছায়া।

এই রকম আরও সব কথাবার্তা। হঠাৎ এক সময় বৃদ্ধা বলে উঠলেন,—জামাই, যা হবার হয়ে গেছে, এবার তুমি একটি বিয়ে করো।

শুনে, আমি আর স্থির থাকতে পারিনি, হঠাৎ উঠে চলে এসেছিলাম। পিছন-পিছন অতুলবাবু বুঝি কিছুদূর পর্যন্ত এসেও ছিলেন। তাঁর সেই 'জামাই' ডাক বহুদূর থেকে পাচ্ছিলাম শুনতে। কিন্তু, না, এই প্রহার থেকে পালাতেই হবে আমাকে।

অথচ, কোথায় পালাবো! দেখতে-দেখতে মাস শেষ হয়ে আসছে, আর তীব্র উৎকণ্ঠায় রাত কাটছে। আতঙ্কে ঘুম আসে না। অতি কষ্টে ঋণগুলির কিছু-কিছু শোধ করেছি, কিন্তু, তারপর?

মনে-মনে কোথায় একটা দুরাশা ছিল, চাকরিটা বোধহয় যাবে না। মালিক আমার অবস্থা বুঝে শেষ পর্যন্ত যেরকম করে হোক রেখেই দেবেন কাছে। কিন্তু হায়রে স্বপ্ন, মাসও শেষ হ'লো, চাকরিও শেষ হয়ে গেল। আবার হলাম আমি বেকার, আবার এলো সেই অপমান-খিন্ন দিন, অবহেলা ভরা কঠিন প্রহরগুলি!

ভোর হতে-না-হতেই মেস্ থেকে উঠে চলে যাই কাজের চেষ্টায়। এসে দেখি, বিছানার কাছে পড়ে আছে একটা বাটিতে শালপাতার ছোট্ট ঠোঙা, তার মধ্যে একটুকরো প্রসাদ আর ফুল!

অসহ্য—অসহ্য মনে হচ্ছে সব কিছু। এদিকে এ-মাস ঘুরেও শেষ হতে চলল, এ হচ্ছে নতুন মেস্, এখানকার টাকা ঠিকমতো না দিতে পারলে চূড়ান্ত অপমান অবশ্যম্ভাবী। এরই মধ্যে ম্যানেজার যে-ভাবে ইসারা-ইঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করেছে, তাতে আর ভরসা করার কিছু নেই। তার ওপরে ঐ প্রসাদ আর ফুল!

শেষ পর্যন্ত, মনের আতঙ্ক আর উত্তেজনা সম্ভবতঃ বিভ্রান্তিরই

সৃষ্টি করলে। মানুষের মন কেমন করে যে হঠাৎ তার অভ্যস্ত পথ ছেড়ে বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করে, তার সংবাদ কি আমিই রেখেছি আগে? ঐ উদ্বেলিত স্নেহ আর ভালবাসা আমাকে যেন হঠাৎ একদিন ভিন্ন পথে চালিত করে নিয়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো একদিন সত্যি-সত্যিই গিয়ে উপস্থিত হলাম সোমেশ্বরপ্রসাদের কাছে, তার মেস-এ। ভাগ্যক্রমে দেখাও পেলাম। সব শুনে সে বললে—চাকরি কি এতদিন বসে থাকবে? সাহেব নিজেই লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—আর বড়বাবু?

সোমেশ্বর একটুক্ষণ থেমে থেকে পরে বললে—তার খঞ্জ কন্যাটি আজও পড়ে আছে কি না জানি না, আচ্ছা আমি খোঁজ নেবো। তুমি কাল এসো।

বললাম—না। যা করতে হয় আজই করে ফেলো। আমি বরং তোমার সঙ্গে তোমার অফিসেই যাচ্ছি আজ।

—যাবে?—ও একটু ভেবে বললে—আচ্ছা চলো, দেখা যাক।

ওরই কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে, ওর সঙ্গে সত্যিই বার হলাম শেষ পর্যন্ত। বাস-এ ঝুলে যেতে-যেতেও ও কথা বলছে। বললে—হঠাৎ এমন মতি-পরিবর্তন হলো যে?

কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

গন্তব্যস্থানের সন্নিকটে বাস-স্ট্যাণ্ডে নেমে পাশাপাশি চলতে চলতে ও বললে—বুঝি ভাই। বাস্তবের দাবী যে কী, তা আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝি। তোমার মতো দিন আমারও গেছে।

বেশ মনে আছে সেদিনের কথা। সোমেশ্বরপ্রসাদ আমাকে নিয়ে গেল সঙ্গে করে তার অফিসে। মোটামুটি বেশ বড়োই অফিস। লিফ্‌টে করে একেবারে তেতলা। প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে কাঠের রেলিংয়ের মতো করে ঘিরে নেওয়া, তার বাইরে, চলাফেরা করার

মতো পথ, পথের ওপারে সারিসারি কাঠের ঘর, শুনলাম, সে সব অফিসারদের জন্য। ও আমাকে নিয়ে গিয়ে বসল সেই রেলিংঘেরা যায়গায় যে-সব সার-বাঁধা টেবিল সাজানো আছে, তারই একটি টেবিলে। একটা চেয়ারে নিজে বসে, অপর চেয়ারটিতে বসতে বললে আমাকে। বললে—তুই বোস। হাতের কাজটা একটু সেরে নি।

কী সব মোটা মোটা খাতা আর ফাইল ওর সামনে স্তূপাকার করা ছিল, তাতে হাত দিয়ে, সবগুলিই একটু উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে নিয়ে, মুখ তুলে চলমান একটা বেয়ারাকে ডাকল, কী সব ফাইলের কথা-টথা বললে তার সঙ্গে। তারপরে, আমার দিকে ফিরে বলে উঠল—তুই বোস, আমি একটু কথা বলে আসি।

চলে গেল। এবং ফিরে এলো মিনিট দশেকের মধ্যেই। বললে —আয়। সব কাজ ফেলে রেখে বড়বাবু আগে তোর সঙ্গেই কথা বলতে চাইছেন।

ওর কথায় উঠলাম বটে, এবং পিছন-পিছন চললামও। কিন্তু সব মিলিয়ে নিজেকে এত হীন মনে হচ্ছিল যে বলার নয়। সমস্ত মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে চলেছি যেন ভিক্ষুকের মতো।

এই রেলিং-ঘেরা হল্‌ঘরটার মধ্যেই কোণের একটা টেবিলে বসেছিলেন তিনি। টেবিল তাঁর সোমেশ্বরের থেকে অনেক বড়ো, ওপরটা সবুজ রেক্সিনে মোড়া, সামনে দুখানা খালি চেয়ার বসানো। দূর থেকেই তিনি লক্ষ্য করছিলেন আমাকে। আমি কাছে এসে অভিবাদন জানাতেই, ডানহাতটা একটু তুলে প্রত্যভিবাদন জানালেন তিনি। তারপরে অস্ফুটস্বরে বললেন—বোসো।

শীর্ণকায় চেহারা, 'বড়বাবু' বলতে যে বিপুল-বপুর কথা চিন্তায় আসে, তার সঙ্গে এঁর মেলে না।

আমরা দুজনে শূন্য চেয়ারদুটিতে বসে পড়েছি। খুব বেশী ভূমিকা না করে সোজাসুজি একেবারে মূল প্রসঙ্গে এসে পড়লেন তিনি।

বললেন—মুখোপাধ্যায় যখন, তখন তোমরা আমাদের পাল্‌টি ঘর। আমরা ভট্টাচার্য।

সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ চমকে কেঁপে উঠলাম আমি। উনি সেটা লক্ষ্য করলেন কি না বোঝা গেল না, বললেন—তবে, আসলে বন্দ্যোপাধ্যায়, সাণ্ডিল্য গোত্র। তা সোমেশ্বরের কাছে সব শুনেছ তো? আমার কাছে লুকোছাপা কিছু নেই। তোমার সম্বন্ধেও আমি সব খোঁজ খবর নিয়েছি। কিন্তু, কথা হচ্ছে, বড্ড দেরি করে ফেললে, সেই চাকরিটা আর খালি নেই।

সোমেশ্বর বলে উঠল—তা বড়বাবু, আমি বলি কী, বিয়েটা হয়ে যাক না, তারপরে ও-ও আছে, আপনিও আছেন, চাকরি একটা ঠিকই ও পেয়ে যাবে।

বড়বাবু মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ, কথাটা তাঁর মনঃপূত হ'লো না। বললেন—ওতে আমি নেই। আগে চাকরি, তারপরে বিয়ে। তবে, কথাবার্তা এখনই পাকা করে নিতে রাজী আছি।

সোমেশ্বর বললে—বেশ তো, যা হয় আপনি করুন। ওকে আমি নিয়ে এসেছি আমার কাছে। যখন যা খবর হয় বলবেন, আমি ওকে জানিয়ে দেবো।

—ভালো কথা!—বড়বাবু বললেন—তবে কাল সকালে ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসো, মেয়ে দেখিয়ে দি। না-না, নিজের চোখে দেখে, সব বুঝে-সুঝে নিক। নইলে, শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্ক, পরে যে দুষবে, তা চলবে না।

চুপ করে আছি মাথা নীচু করে। বড়বাবু বললেন—কী হে, কিছু বলো?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল সোমেশ্বর,—ও কী বলবে? আমি বলছি ওর হয়ে। কাল যাবো ওকে নিয়ে সকালে। এই সাতটা নাগাদ।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই এসো,—বড়বাবু বললেন—বোঝো তো অফিসের ব্যাপার! আমাকে আসতে হয় অফিস আরম্ভ হবার ঢের

আগে। কথাটা সম্ভবতঃ আমাকে উদ্দেশ করেই বলেছিলেন তিনি।

সোমেশ্বরের মেসে, সোমেশ্বরের ঘরেই এসে উঠেছিলাম আমি। কাউকে জানাইনি ঠিকানা, বৃন্দাবনকেও না। সেদিন ওর অফিস থেকে ফিরে এসে ওর পাশের তক্তপোষে, যেখানে আমার বিছানাটা গোটানো ছিল, সেখানে শুয়েছিলাম চুপচাপ। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে মনে মনে, বারবার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠতে চায়—এ কী করছ তুমি? এ ভালো নয়, কখনোই ভালো নয়।

এক-একবার মনে হচ্ছে, ছুটে পালাই এখান থেকে। একা তো মানুষ, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতেই বা দোষ কি? হঠাৎ এক বন্ধন এসেছিল, সে শশী, কিন্তু সেও গেছে ছেড়ে আমাকে। ভাগ্য আমাকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করতে চায় সপ্তরথীর মতো। ইংরেজীতে 'চালেঞ্জ' বলে যে কথাটি আছে, সেটি বোধ হয় আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাগ্য আমাকে চালেঞ্জ করতে চায়। মাথা নত করব? না। মনে হ'লো, দেখাই যাক না, জীবনের প্রকৃত রূপ কী, তা তো সম্পূর্ণ জানা হ'লো না আজও। সৌভাগ্য আসি-আসি করেও দ্বারদেশে মাথাকুটে মরে ফিরে গেছে। এ যা আসছে, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, এও শেষ পর্যন্ত কাছে এসে ফিরে যাবে কি না জানি না। দেখা যাক। নিজেকে ঘটনার দিকে এগিয়ে দিয়ে, আর-এক নির্লিপ্ত মন নিয়ে সব-কিছুকে নিরীক্ষণ করে যাওয়া—তাই বা মন্দ কী?

গেলাম পরদিন সকালে অদ্ভুত এক জগতে। উত্তর কলকাতারই একপ্রান্ত। গলির পর গলি, তারও ভিতরে এক উপগলি। ইঁট-বারকরা বহু পুরাতন বাড়ি, একদিককার দেওয়াল ভেঙে অশ্বত্থ মাথা উঁচু করে তার ডালপালা বিস্তার করেছে। মানুষগুলিও যেন অন্য জগতের, বাইরে, পথ চলতে চলতে যাদের দেখি, তাদের সঙ্গে মেলে না।

কলতলায় ঝি বসেছে একরাশ বাসন নিয়ে, তার চারিদিকে কাক উড়ছে আর বসছে, ঝি তাদের গালাগাল দিচ্ছে আর হাতের কাজ

করছে। হুটো বেড়ালও এসে জুটেছে এঁটোকাঁটার লোভে। সেই পরিবেশের মধ্য দিয়ে একটু হেঁটে এসে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম এক বারান্দায়। বারান্দার পরে ছোট্ট একটা ঘর, তাতে তক্তপোষটা এমন জুড়ে বসে আছে যে, এ-পাশে ও-পাশে কষ্টেস্‌ষ্টে যাতায়াত করতে পারে একটি লোক।

বড়বাবুর নাম—হীরালাল ভট্টাচার্য। খালি. গায়েই ঘুরছেন, পরনে একখানা আধময়লা খাটো ধুতি। আমাদের হুজনকে খাটের ওপর বসতে দিয়ে হাঁক-ডাক করতে লাগলেন। কে একটি কালো মতন রোগা মেয়ে এসে হুটি 'আস্থন-বস্থন' লেখা আসন দিয়ে গেল। অর্থাৎ তক্তপোষের ওপর ও-হুটি পেতে নিয়ে আমরা যেন বসি। বড়বাবু এলেন ঠিক তার পরে। নিজেই হুহাতে হুটি রেকাবী নিয়ে, তাতে হুটি করে সিঙাড়া আর পানতুয়া। আমাদের সামনে ঠক্ করে নামিয়ে দিয়ে বললেন—খাও। ওরে জল নিয়ে আয়।

বলতে-বলতে নিজেই গেলেন বেরিয়ে। সেই কালো রোগা মেয়েটিই এলো জল নিয়ে কাঁসার গেলাসে করে। তারপরে আবার সে চলে গেল। সোমেশ্বরকে নিম্নকণ্ঠে বললাম—এ মেয়েটিও দেখছি খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ওঁর আরও খোঁড়া মেয়ে আছে নাকি?

সোমেশ্বর একটু যেন অবাক হ'লো, বললে—সত্যি কথা বলতে কী, এর আগে বড়বাবুর বাসায় যখন এসেছি অফিসের কাজে, ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শেষ করেই চলে গেছি, ভিতরে আসিনি কখনো। হবেও-বা, আরও খোঁড়া মেয়ে থাকতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে আবার এলেন বড়বাবু, হুহাতে হুটি চায়ের কাপ নিয়ে। সোমেশ্বর বলে উঠল—আপনি কেন নিজের হাতে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বড়বাবু,—মুসকিল কী হয়েছে জানো, কাল রাত্রে এসে দেখি, গিন্নীর এসেছে জ্বর। সংসারে গিন্নী জ্বরে পড়লে যা হয়, তাই হয়েছে আর কি! বেশ জ্বর, মাথা তুলতে পারছেন না!

সংকুচিত হয়ে সোমেশ্বর বললে—তাহলে, ঠিক আজকের দিনে—

বড়বাবু বললেন—তাতে কী, এ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কতলোক যে দেখতে এলো, তার কি ইয়ত্তা আছে? এই করে করে চারটিকে পার করেছি, এটি পঞ্চম।

বলেই, আমাদের দিকে তাকিয়ে,—খাও তোমরা, খাও।

এ পালা চুকে যাবার পর উনি আবার হাঁক-ডাক শুরু করলেন, বললেন—কইরে, পান নিয়ে আয়?

রেকাবীতে করে পান নিয়ে এলো সেই রোগা, কালো মেয়েটিই। বছর পনেরো-ষোলো বয়স হবে বড়জোর। পান রেখে সে চলেই যাচ্ছিল, বড়বাবু ডেকে বললেন—দাঁড়া।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বড়বাবু বললেন—আমার ছোট মেয়েটির আবার মর্নিং স্কুল। তাই এই মেয়েকেই সব কাজ করতে হচ্ছে। এই যে এর কথাই বলছিলাম। সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবে আর কে? মার তো অসুখ।

তারপরে, আমার দিকে ফিরে বললেন—দেখ বাবা, পছন্দ হয়?

ব্যাপারটায় এত বিস্মিত হয়েছিলাম যে বলার নয়! এখন 'পছন্দ'র কথায় এলো একটা সংকোচ। মুখ নীচু করে রইলাম। শুনতে লাগলাম, সোমেশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে বড়বাবু বলছেন—বয়স লুকোবো না, এই সতেরো ছাড়িয়ে আঠারোয় পড়ল। আমরা আবার সকাল-সকাল বিয়ে দেবার পক্ষপাতী, ধিঙ্গী করে পুষে রাখবার ইচ্ছে আমাদের নেই। কী, জিজ্ঞাসা করো ওকে কিছু—পরমেশ?

সোমেশ্বর, আমার দিকে একবার তাকালো, তারপরে বললে—লজ্জা পাচ্ছে। আমিই জিজ্ঞাসা করি। নাম কী আপনার?

কেমন যেন মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হলো—সাবিত্রী।

—রান্নাবান্না, ঘরের সব কাজ-টাজ—

বড়বাবু বলে উঠলেন—সংসার একেবারে মাথায় করে রেখেছে।

সোমেশ্বর হয়ত আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—সোমেশ্বর, ওঁকে যেতে দাও।

একটু অবাক হয়েই বোধ হয় আমার দিকে তাকালেন হীরালাল-বাবু, তারপরে, কী বুঝে, মেয়েকে বললেন—আচ্ছা, সাবি, তুই যা।

যেমন নতমুখে সে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি নতমুখেই খোঁড়া বাঁ পা-টি টেনে টেনে সে বেরিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—আমি রাজী।

ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠা বোধ হয় দূর হলো, বললেন—ঠিক আছে। তোমাকে আমি সোমেশ্বরের মারফৎ খবর পাঠাবো। আগে চাকরি, তার পরে বিয়ে। ও-সব তঞ্চকতার মধ্যে আমি নেই। বিয়ে দিয়ে মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে শেষ পর্যন্ত সরে পড়লাম, আমি সে-দলের নই। আহা, যদি তখন রাজী হতে, ও-চাকরিটা তোমার হয়ে যেতো! দেখি, চেনাশুনো সবাইকে বলি। হয়ে যাবেই একটা-কিছু, ভেবো না।

না, ভাববার বেশী কিছু ছিল না। শুধু পথে বেরুতে ভয় করতো, যদি দেখা হয়ে যায়? যদি পথ চলতে-চলতে হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পাই,—জামাই?

আমি তাহলে বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো। তার চেয়ে এই ভালো, এই বিশীর্ণ আর কালো খোঁড়া মেয়ে, আর ঐ চাকরির প্রতিশ্রুতি। সোমেশ্বরের ব্যবস্থায় ভবানীপুরে, ওর মেসে এসে, ওরই বন্দোবস্তে, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে যাচ্ছি বটে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে, যদি সব আশার আলো আবার মরীচিকার মতো সামনে থেকে মিলিয়ে যায়! তাহলে কী করবো? কেমন করে করবো সোমেশ্বরের ঋণশোধ?

তাই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, আর ওকে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করি,—কী রে, হ'লো কিছু?

—দাঁড়া না, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

কী করে ওকে আমার অন্তরের দুর্ভাবনার কথাটা বলি? কেমন করে বলি আমার আশঙ্কার কথাটা? আমার এক-এক সময় এ-ও মনে হচ্ছে যে, যদি অন্য কেউ এসে পড়ে? যদি অন্য কেউ এসে

বলে,—আমি বিয়ে করতে রাজী, চাকরি একটা আমাকে করে দিন ?

কিন্তু, কী-এক সংকোচ এসে কণ্ঠ রোধ ক'রে ধরে, সোমেশ্বরকে এ-কথা বলি বলি করেও বলা হ'লো না। এবং আশ্চর্যের কথা, এই ভাবে নিরাবলম্ব অবস্থায় থাকতে থাকতে, একমাস নয়, ছুমাস নয়, কেটে গেল চার-চারটি মাস। মেসের সব টাকা অম্লান বদনে দিয়ে যাচ্ছে সোমেশ্বর, আমাকে একটিও কথা না বলে। জিজ্ঞাসা করতাম —তোমার কাছে আমার কতো যে ঋণ জমে যাচ্ছে সোমেশ্বর— !

ও বললে—কিছু ভেবো না। সময় এলে সুবিধামতো শোধ দিও। অত ভাবলে চলে না। চাকরি তোমার হবেই। বড়বাবুর খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে। বলেছেন—ঠিক আজকালকার চালিয়াৎ ছোকরাদের মতো না, অন্য রকম। ছেলে তুমি ভালোই এনে দিয়েছ সোমেশ্বর।

—কিন্তু, পথের ফকির।

সোমেশ্বর বললে—তুই থাম তো। 'ফকির' বলে জাঁক করারও কিছু নেই, আক্ষেপ করারও কিছু নেই। আজকের দিনে কে যে কখন আমীর হচ্ছে, আর কে যে কখন ফকির হচ্ছে, কেউ কিছুই বলতে পারে না। হয়ত চাকরির পর তোরও অবস্থা ফিরে যেতে পারে। না-না, চাকরি করে নয় অবশ্য। হয়ত ব্যবসায়িক বুদ্ধি জন্মাবে তোর মধ্যে। সওদাগরী অফিসের কাজ, করতে করতে শিখতে শিখতে তুই-ই হয়ত অফিস খুলে বসবি একদিন। কে বলতে পারে ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—অতো আশার কথা শুনিয়ো না ভাই।

—কেন শোনাবো না—সোমেশ্বর বললে—আমি ভাই অ্যাম্‌-বিশাস্‌ লোক। বড়বাবুর সঙ্গে কথাই আছে, যদি আমি ভালো জামাই জোগাড় করে আপনাকে দিতে পারি, তাহলে উনি আমাকে একটা লিফ্‌টের ব্যবস্থা করে দিয়ে বম্বের অফিসে বদলী করে দেবেন। তখন একবার চেষ্টা করে দেখব, ভাগ্য ফেরাতে পারি কি না ! লোকে বলে, বম্বেতে নাকি টাকা উড়ছে, কৌশলে ধরতে পারলেই হ'লো।

কথার পিঠে আরও বহু কথা বলে গেল সোমেশ্বর। এবং তার দিন কয়েক পরে, একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—ওরে, কাল চল আমার সঙ্গে। বড়বাবু ঠিক করেছেন তোর একটা চাকরি ওঁর এক বন্ধুর অফিসে। আমদানী-রপ্তানীর অফিসে। সবশুদ্ধ প্রায় দুশো টাকা মাইনে।

—বলিস কী!

—হ্যাঁ। আয় তুই।

গেলাম। হীরালালবাবু বললেন—বোসো। তোমাকে নিয়ে বেরুতে হবে।

বসেই রইলাম সোমেশ্বরের টেবিলের সামনে। ও কাজ করতে লাগল, আমি দেখতে লাগলাম বসে বসে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হয়ে যাবার পর এলেন হীরালালবাবু, বললেন—এসো হে, আমার সঙ্গে।

যন্ত্রচালিতের মতোই ওর সঙ্গে চলতে লাগলাম জনাবণ্যের মধ্য দিয়ে। ভদ্রলোকের দেহযষ্টি কেমন যেন একটু নুয়ে পড়েছে, হাঁটছেন, হাতের আঙুলগুলি থর থর করে এক-এক সময় কেঁপে কেঁপে উঠছে, লক্ষ্য করলাম। স্নায়ুর কোনো রোগ হবে। লক্ষ্য করতে করতে একটু মায়াও হ'লো। ছয়-ছটি কন্যার পিতা, প্রতি কন্যার জন্যই কি এমন করে চাকরি স্থির করে দিয়ে জামাই সংগ্রহ করতে হয়েছে নাকি ভদ্রলোককে?

এক সময় থমকে দাঁড়ালেন রাস্তার ধারে, বলে উঠলেন অদ্ভুত কোমল কণ্ঠে,—পরমেশ, এসো বাবা রাস্তাটা পার হই এখানে।

নেতাজী সুভাষ রোডের অপর পারে এসে ফুটপাথ ধরে আরও ভিতরের দিকে যেতে লাগলাম আমরা। আমদানী-রপ্তানীর এক গুজরাটিদের অফিস। ওঁর বন্ধুও এ-অফিসের বড়বাবু। তারই মাধ্যমে চাকরিটা আমার হয়ে গেল এক কথায়। নিয়ে গেলেন বড়সাহেব ওয়াঙ্কাওয়ালার কাছে। দেখলেন আমাকে তিনি, দুটো

একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন, তার পরে, হীরালালবাবুর বন্ধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার লোক?

—হ্যাঁ।

—নিয়ে নাও। ওর আর কী।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নয়, কিছু নয়, ভদ্রলোক বলে দিলেন—কাল তবে এসে জয়েন করো। ঠিক মামুলি কেরানীর কাজ নয়, ঘুরতে হবে বাজারে। যে-সব পণ্য নিয়ে আমাদের ব্যাপার, সেই সব পণ্যের বাজার দর, ষ্টক, এই সবের খোঁজ করে বেড়াতে হবে, অফিসে এসে ষ্টেট্‌মেণ্ট্‌ লিখতে হবে, ইত্যাদি।

হীরালালবাবু বললেন—সে ও খুব পারবে।

অফিস থেকে ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে আবার পথ হাঁটছি, উনি বললেন—নিশ্চিন্ত তো? এইবার বিয়ের দিন স্থির করে ফেলি?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

পরদিন জয়েন করলাম। এবং প্রথম দিন থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কাজে। একটা যেন নেশাও লাগল। অফিসে গিয়ে হাজিরা দিয়েই বেরিয়ে পড়ি, একটা-ত্নটোয় ফিরে এসে টেবিলে বসি, তখন চলে খাতা লেখালেখির কাজ। হীরালালবাবুর বন্ধুর নাম—ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। আমার কেরানী সহকর্মীবৃন্দ আড়ালে বলে—"গড লায়ন"। কখনো বা সেটাকেই সংক্ষিপ্ত করে—'এই গড আসছে'! কখনো বা 'লায়ন আসছে' বলে। কেউ-কেউ আমাকে দেখলে পারস্পরিক পর্যালোচনা থামিয়ে দেয়, বলে—'গডের লোক'। এবং, এই কথাটাই আমার সাত-আট দিন কর্মজীবন কাটানোর পর, লক্ষ্য করলাম, দাঁড়িয়ে গেছে—'গডস্‌ ম্যান'। অফিসে বাঙালী অল্প, অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী, গুজরাটি, আর মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। সবার কাছেই আমি ক্রমে ক্রমে, হয়ে দাঁড়ালাম 'গডস্‌ ম্যান'! কারুর কাছে কোনো কাজ নিয়ে গেলে তারা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করল—হ্যালো, গডস্‌ ম্যান? হোয়াট্‌স্‌ আপ?

রাগ আসে না, অভিমান আসে না, আসে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। তাও নিজের মনে নিজে যখন কথাটা ভাবি, তখন অন্য তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয় কথাটা। ভাবি, সত্যিকার 'গডস্ ম্যান' বলে কেউ আছে নাকি? থাকলে, তারা কারা? ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তো, তাঁর অনুগ্রহের স্বরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করছে যারা, তারাই কি ঈশ্বরের মানুষ, না, যারা দুঃখে আর দুর্দশায় পড়ে প্রতিনিয়ত প্রহার লাভ করছে, আর আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মাঝে—'উঃ! ভগবান!' —তারা, ঈশ্বরের মানুষ? যদি তারাই হয়, তবে, এত কষ্ট কেন, এত দুঃখ কেন, এত লাঞ্ছনা কেন, এত আত্মাবমাননা কেন? এক বিদেশী কবির ভাষায়,—দুঃখে পড়ে যাতে মানুষ তাঁর নাম উচ্চারণ করে, তার জন্যই কি তাঁর দুঃখ-রচনার আয়োজন?

এইভাবে দিনের পর দিন চলে গিয়ে একটি মাস কেটে গেল। প্রথম মাইনে পেয়ে সোমেশ্বরের হাতে তুলে দিলাম, বললাম—রাখ।

—সে কী?

—মেসের দরুন তোর কাছে ধার আছে না?

ও বললে—তা বলে, এতো?

—এতোই। যে মাস পড়েছে, এ-মাস নিয়েই অবশ্য। আমার হিসেব আছে। ট্রামবাসের খরচা-স্বরূপ দশটা টাকা দে বরং। এ-টাকা ধার নিলাম। সামনের মাসে শোধ দেবো।

ও অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে, মনে আছে।

পরদিন ও বললে—এই, তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। আজ যাস একবার বড়বাবুর কাছে, আমাদের অফিসে।

গেলাম। না গিয়ে আমার উপায়ও নেই। কথাবার্তা সবই হ'লো। যে-তারিখের কথা উনি বললেন, তা গুনে দেখছি, দিন পনেরো সময়ও আর নেই। কেমন যেন হঠাৎ আতঙ্ক হ'লো মনে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই এলো তুচ্ছ করে দেবার একটা ভাব। সোমেশ্বরকে

গিয়ে বললাম—বরযাত্রী বলতে কিন্তু—একমাত্র তুই।

চুপচাপ বসে ছিল একটা চেয়ারে। কেমন যেন থমথমে—গম্ভীর ওর মুখের ভাব। একটু হেসে বললে—দুর্ভাগ্য আমার, তোর বিয়েতে থাকতে পারব না। সেই কথাই এতক্ষণ ভাবছি বসে বসে।

—সে কী!—কেন?

সোমেশ্বর বললে—ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি বম্বে। তোর বিয়ের ঠিক আগের দিন আমার জয়েনিং ডেট্।

বসে পড়লাম ওর খাটের ওপর ধপ্ করে। ও বললে—এই মেসেই তুই থাকবি। ম্যানেজারকে সব বলা-কওয়া করা আমার হয়ে গেছে। চুপ করে রইলাম। এ কয় মাসে ওর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলাম, যে, ও আমার একটা অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিন কেটে যাচ্ছে, যত আসন্ন হয়ে আসছে ওর যাওয়া, ততই অস্থির হয়ে উঠছে মন। কাজে-কর্মে সারাটা দিন বেশ কেটে যায়, রবিবারের ছুটি আর কাটতে চায় না। লোকে সিনেমায় যায়, আমার যেতে ইচ্ছা করে না। লোকে পার্কে গিয়ে বসে থাকে, আমার সে ইচ্ছা হয় না, লোকে রাস্তায় হেঁটে একটু বেড়িয়ে আসে, সে অভিলাষও মনে জাগে না আমার! সে চিন্তা মনে এলেই সংকুচিত হয়ে উঠি, ভাবি, যদি চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

কিন্তু, এ বিচিত্র মানসিকতার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন কাটবে কেমন করে? এক-একদিন মনে অস্বাভাবিক জোর এনে বেরিয়ে পড়ি, মনে মনে বলি, কী করেছি আমি? কী আমার অপরাধ?

এইরকম ভাবে একদিন বেরিয়ে পড়ে ভবানীপুরেরই এক রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ অভাবিতরূপে দেখা হয়ে গেল বৃন্দাবনের সঙ্গে। ওর টাকা সব আমি শোধ দিয়ে এসেছিলাম মনে পড়ে, ও আর আমার পাওনাদার নয়, তবু ওকে দেখে বুকটা আমার এমন 'ধড়াস্' করে উঠল কেন? তেমনি ম্লান মলিন ঘর্মাক্ত চেহারা, খাকীর হাফসার্ট, আর আধময়লা ধুতি। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে,

কিছুক্ষণ ও কথাই বলতে পারল না। আমার পরনে সেদিন ছিল একটা সিল্কটুইলের সার্ট, আর মিলের পাতলা ভালো ধুতি—সবই ঝক্‌ঝকে—পাটভাঙা। এ আমাকে জোর করে বাজারে নিয়ে গিয়ে কিনিয়ে দিয়েছিল সোমেশ্বর।

—কেমন আছিস, বৃন্দাবন?

ও বললে—চিনতে পেরেছ তাহলে?

হেসে বললাম—কী যে বলিস! চিনতে পারব না কেন? তোর খবর কী বল?

নিজের খবর কিছু বলল না, বলল অন্যের খবর।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—তোমার শ্বশুরের খবর জানো?

চমকে উঠলাম ভিতরে-ভিতরে। অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলাম—শ্বশুর?

ও ততটা খেয়াল করল না, নিজের কথায় নিজেই মগ্ন হয়ে বলতে লাগল—প্রায়ই মেসে এসে খোঁজ করে তোমার। তাঁর ধারণা, আমরা সবাই তোমার নতুন ঠিকানা জানি, ইচ্ছা করে জানাচ্ছি না তাঁকে! দেখে বড়ো কষ্ট হয়। একদিন ডেকে, কাছে বসিয়ে সব শুনে নিলাম। কী আর বলব, খুব গরীব হয়ে গেছে, ছবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না, এমন অবস্থা। ওদের কিছু অর্থ সাহায্য করা দরকার, নইলে বুড়োবুড়ী নির্ঘাৎ মারা পড়বে!

কিন্তু, আশ্চর্য মানুষের মন। ওর মুখে ঐ 'শ্বশুর' উক্তিটা শুনেই হোক, অথবা যে-কোনো কারণেই হোক, আমি একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বলে ফেললাম—কে কোথায় খেতে না পেয়ে মারা পড়বে, তারই খোঁজ করে বেড়াই আর কী! আর, শ্বশুরই বা কীসের? আমি এদিকে বিয়ে করছি, সামনের অঘ্রানেই বিয়ে।

সব শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিল বৃন্দাবন, যে, আর কিছু বলতে পারেনি। আমি ওকে ছাড়িয়ে আবার পথ চলতে শুরু করেছি, ও পিছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখছে বটে, কিন্তু মুখে

ওর কথা সরছে না, আমাকে ডেকে আমার ঠিকানাটাও যে জেনে নেবে, এ-ও বুঝি ওর ভুল হয়ে গেল মুহূর্তে !

আমি হনহন করে এগিয়ে গিয়ে পথের মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে এলাম।

বিবাহের দিন, সোমেশ্বরকে পেলাম না, মেসের কাউকে বলিনি, তেমন আলাপও হয়নি কারুর সঙ্গে। সঙ্গে নিলাম অফিসেরই সহকর্মী তিনজনকে বরযাত্রী হিসাবে ; কন্যাপক্ষের পুরোহিতই আমার স্বপক্ষে কাজ করবেন স্থির হয়েছিল। সোমেশ্বর ওর যাবার দিন শ্বশুরের কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে একশো এক টাকা আর একটা আংটি নিয়ে এসেছিল, বলেছিল—তাঁর হয়ে আশীর্বাদ আমিই করছি। ভদ্রলোকের কাজ পড়েছে অফিসে। নিয়মতান্ত্রিক আশীর্বাদ একেবারে বিয়ের দিনেই হবে।

সোমেশ্বরই জামা-জুতো প্রভৃতি কিনে দিয়ে গিয়েছিল ঐ টাকা থেকে। বাকী টাকা আমাকে দিয়ে আমার হাত দুটো ধরে ছলছল চোখে বলেছিল—ট্রেনের টাইম হয়ে এলো। হে বন্ধু বিদায়।

সমস্ত আবেগ এসে অকস্মাৎ কণ্ঠ রোধ করেছিল আমার, অতি কষ্টে সেদিন বলেছিলাম—এখনো কিছু টাকা পাবে যে তুমি, এ টাকা থেকেই বরং—

ও আমার হাতে চাপ দিয়ে সজল চোখে বলেছিল—দূর পাগল !

বলে আর দাঁড়ায়নি, মোট-ঘাট নিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে পড়েছিল তাড়াতাড়ি। আমরা বলেছিলাম—স্টেশন পর্যন্ত যাবো ?

—না-না।

—না, কেন ?

ট্যাক্সির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল,—বাপ-মা, স্ত্রী, কেউই এলো না যখন, তখন তোমরা আর সি-অফ করতে স্টেশনে যাবে কেন, মিছামিছি ?

আর, তারপরে, ওর নির্দেশে ফুস্ করে ছেড়ে দিয়েছিল ওর ট্যাক্সি।

বিয়ে বাড়িতে পৌঁছলাম সন্ধ্যার একটু আগে, গোধূলি লগ্নে বিয়ে। কোনো কোলাহল নেই, কিছু নেই, কেমন যেন নিস্তব্ধ পরিবেশ। আমি যাওয়ামাত্র যে কেন শাঁখটা বাজিয়ে দিলো শুধু। হীরালালবাবু আমাদের একেবারে বারান্দায় বসিয়ে দিলেন বিয়ের পিঁড়িতে। বললেন—লগ্ন হয়ে গেছে।

হয়ে গেল বিয়ে। ঘরে গিয়ে বসেছি, শ্বাশুড়ী, ছোট শালী আর আমার স্ত্রীর ঠিক ওপরে যে বোন, সেই এসেছে শুধু স্বামীর সঙ্গে। আর বড়ো তিন বোন আসেননি। কথাবার্তায় শুনলাম, শ্বশুরবাড়ি থেকে তাদের আসতে দেয় না। মোট কথা, সব মিলিয়ে কেমন যেন নিঃঝুম নিষ্প্রভ পরিবেশ! ভিতরে-ভিতরে স্বাচ্ছন্দ্যই অনুভব করছিলাম আমি। কেমন অদ্ভুত একটা আরাম—আঃ!

ফ্রক-পরা রোগা লিক্‌লিকে চেহারা মেয়েটিই ঘোরাঘুরি করছিল বেশী। আমার ছোট শালী। বড়ো শালী খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে চলে গেল। রাত এগারোটার পর বাড়ির দরজায় খিল পড়ল। রুগ্ন শাশুড়ীর হাঁপানীর টান বেড়েছে, নব পরিণীতা একবার গাঁটছড়া-বাঁধা চাদরখানি বুকের কাছে দু'হাতে জড়ো করে নিয়ে একবার দেখে এলো মাকে। ছোট শালীকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নাম কি?

লজ্জায় মুখ নীচু করে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত অনেক পীড়াপীড়িতে বললে—কল্যাণী।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার দিদির নাম কী?

ফিক করে হেসে ফেললে, বললে—জানেন না?

মাথা নেড়ে জানালাম—না।

ছোট মেয়ে তো, বলে বসল—পদ্য ছাপাননি কেন, বিয়েতে? ন'দির বিয়েতে কেমন পদ্য হয়েছিল, হলদে কাগজে।

হেসে বললাম—তোমার বিয়েতে হবে'খন।

—যাঃ!—বলে ব্রীড়াভঙ্গি করে হাতখানা উঁচু করল ঐটুকু মেয়ে। যেন মৃদু প্রহার করতে চায়!

ইতিমধ্যে বুকের-কাছে-চাদর-জড়ো-করা ওর ছোড়দি এসে পড়ল। এসে, বসল তার স্থানটিতে, আমার পাশে। কল্যাণী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে দিদির কাছ ঘেঁষে গিয়ে বসল, বললে—জামাইবাবু তোমার নাম জানে না, জানো দিদি?

ওর হাসি থামতে, মুখখানা একটু আমার দিকে ফিরিয়ে, নত দৃষ্টিতে বললে—সাবিত্রী।

বললাম—ভালোই তো নাম।

খিলখিল করে আবার হেসে উঠল কল্যাণী। তারপরে, হাসতে হাসতে ঘর থেকে ছুটে পালালো। তারপরে, বাইরে থেকে দরজাটা দিলো ভেজিয়ে। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বললে—খিল দিয়ে দে ছোড়দি।

সত্যিসত্যি তখ্‌খুনি উঠে পড়ল সাবিত্রী বুকের কাছে আবার সেই চাদর জড়ো করে। গিয়ে খিলটা উঠিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এলো। সেই যে প্রথম দিন যে-ঘরে এসে বসেছিলাম আমি আর সোমেশ্বর, সেই ঘরেই হয়েছে আজ বাসর, খাটগুলি বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে উঠোনে। মেঝের একপাশে ধবধবে চাদর পেতে বিছানা করা। তারই ওপর বসে আছি আমরা।

ও এসে আবার ওর স্থান অধিকার করতেই বললাম—খিল দিলে কেন?

খুব নিম্ন, অনুচ্চকণ্ঠে ও বললে—চোর-টোর আসতে পারে।

কেন?

—গয়না। মেজদির বিয়েতে এসেছিল।

তারপরেই, মুখ তুলে তাকালো, ঠিক সেই শুভদৃষ্টির সময়কার মতন, পরক্ষণেই নামালো চোখ, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি। বললে—শোবেন না?

—শোবো ?

—শোন্ না ?

সারাদিন উপবাসে কাটিয়ে অবশেষে রাত্রিবেলা ভোজনটা একটু বেশীই হয়েছে। ক্লান্ত লাগছিল শরীর। তাই, ও বলা মাত্রই বিছানায় পা তুলে নিয়ে—বালিশ কোন দিকে আছে দেখে নিয়ে—তাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ও সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে বসল, হাঁটু মুড়ে। ফলে, ওর স্থান হলো আমার একেবারে বুকের কাছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বললাম—শোবে না ?

ও আবার একটু মৃদু হাসল, তারপরে মাথা নেড়ে জানালো—না।

আস্তে আস্তে ওর হাতখানা ধরলাম আমি। পাণিগ্রহণ তো আগেই হয়ে গেছে, এখন ধরার পর আমার হঠাৎ সেই অতীত অনুভূতিটা ফিরে এলো, সেই সীমাচলমে—সুদক্ষিণার হাত যখন ধরেছিলাম। মনে হয়েছিল, যেন ভীরু কপোতীর নরম বুকখানা প্রবল ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে আমার মুঠির ভিতরে !

ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলাম হাত।

ও মুখ নীচু করে তেমনি বসে আছে চুপচাপ। খানিকক্ষণ পরে, ও-ই কথা বললে। অনুচ্চ, অস্ফুট কণ্ঠস্বর। বললে—মা নেই !

একটু বুঝি চমকেই উঠলাম, ঠিক অনুধাবনও করতে পারলাম না প্রশ্নটার তাৎপর্য। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম সবিস্ময়ে।

আবার তেমনি ভাবেই ও বললে—বাবাও নেই !

বললাম—কার কথা বলছ ! আমার বাবা-মা ?

চোখদুটি তুলে আমার দিকে মুখ ফেরালো, কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে ফেলল মুখ, বললে—হ্যাঁ। তাঁরা নেই, আমি কার কাছে যাবো ?

উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি, বললাম—আমার যে কেউ নেই, সেকথা শোনো নি ?

ও বললে—শুনেছি, সেইজন্যই তো ভয়-ভয় করে।

বললাম—সব শুনে-টুনেই তো বিয়েতে রাজী হয়েছ। আমার কি দোষ বলো ?

চোখ তুলে তাকালো আবার, এবার আর মুখ নামালো না। সে-চোখে ফুটে উঠেছে অভাবিত বিস্ময়! পরক্ষণে, কী ভেবে, মৃদু একটু হেসে মুখ নামালো, বললে—যান, সব আপনার দুষ্টুমি! আমি বুঝি তাই বলেছি ?

—তবে ?

ও বললে—মা থাকলে বেশ হতো! আপনি যখন আমাকে বকবেন, তখন তাঁর কোলে গিয়ে মুখ লুকোতাম।

একেবারে ছেলেমানুষ, একেবারে সরল! এতক্ষণে বুঝলাম, ও কী বলতে চায়! বুঝে, মনটা প্রসন্নও হলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে মার কথা মনে পড়ে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মা থাকলে, সত্যিই সে ওকে ভালোবাসত। ও ছেলেমানুষ, ওর সব ব্যথা—সব অভিমান মা বোধহয় নিমেষে দূর করে দিতে পারত!

কিন্তু, সে সব কথা না তুলে, জিজ্ঞাসা করলাম—আমি তোমাকে বকবই বা কেন ?

ও বললে—বা রে! সবাই তো বকে! আমি যে কিচ্ছু জানি না, ঘর-সংসারের কাজ ভালোমতো এখনো শিখে উঠতে পারিনি। আমার মা কতো বকে না তাই নিয়ে ?

সত্যি বড়ো মায়া হলো, ওর হাতটা তুলে হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম—তোমার সংসারে তুমি যাচ্ছ, যা করবার সব তো তুমিই করবে, কে তোমাকে কী বলতে যাবে ?

ও আমার দিকে একটু সরে এসে, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল—আমাকে তৈরী করে নেবেন আপনি ? আপনি যা বলবেন, আমি সব শুনব।

বললাম—সে তো সব স্বামীর কথা সব মেয়েই শোনে। শোনে না ?

মুখ টিপে হেসে বললে—না মশাই, আমাদের পাড়ার এক-একটি

মেয়ের খবর তো আপনি জানেন না ?

ওর কাঁধে হাত দিয়ে আকর্ষণ করে নিলাম নিজের কাছে। বললাম —পাড়ার খবর থাক। বলো তো, আমাকে পছন্দ হয়েছে কি না ? ও লজ্জা পেয়ে মুখ লুকালো আমার হাঁটুর ওপর।

বললাম—মুখ তোলো।

ও সেইভাবে থেকেই মাথাটা নাড়ালো, বলতে চাইল—না।

বললাম—এই দেখ, কার সঙ্গে কথা কইব, তাহলে ? এই, শোনো ? উত্তর দাও আমার কথার ?

অনেক পাড়াপাড়িতে তুলল মুখ, মৃদু কণ্ঠে বললে—মাও জিজ্ঞাসা করছিল ঐ কথা।

—কী ?

—পছন্দ হয়েছে ?

—তুমি কি বললে ?

লজ্জায় মাথা হেঁট করে বোধহয় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে। জোর করে মুখ তুলে দিলাম, বললাম—বলো না ?

হঠাৎ দেখি, ওর চোখে জল ! বললাম—এ কী !

কান্নাভরা কণ্ঠে ও বললে—আকাশের চাঁদ পেয়েছি আমি। ভাগ্য কার আমার মতো ?

মুহূর্তে, সমস্ত উচ্ছ্বাস আমার স্তব্ধ হয়ে গেল। স্থির হয়ে বসে রইলাম। ও সভয়ে প্রশ্ন করল—কী হলো ?

—কিছু না। শুয়ে পড়ো। অনেক রাত।

তারপরে, দিনের পর কেটে গেছে দিন, মাসের পর মাস। ঘুরে-ফিরে সেই আমাদের পূর্বতন উত্তর কলকাতাতেই ছোট্ট বাসা করেছি একটা। সাবিত্রী কালোই বটে, খঞ্জও। কিন্তু, মানুষটি অদ্ভুত। ওর বাবার ও পঞ্চম কন্যা, এ-কথা বলেছি। আরও একটি মেয়ে রয়েছে তাঁর সংসারে। ছয় কন্যা নিয়ে যাঁকে সংসারের পথ পরিক্রমণ

করতে হয়েছে, তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা যে কতদূর সীমিত হতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন নয়। পাঁচ-পাঁচটি কন্যার বিবাহ দিয়েছেন, যত কৌশলীই তিনি হোন না কেন, ঋণভার পরিহার করতে পারেননি। শুনলাম, আগের চারটি মেয়ের জন্য জামাইদের চাকরি জোগাড় করে দিতে হয়নি বটে, তবে খরচা করতে হয়েছে অজস্র। বাড়িখানা বাঁধা পড়ে আছে তৃতীয় কন্যা থেকেই।

এই তো ছিল ওর পরিবেশ। সেই পরিবেশ থেকেই ঈষৎ-খুঁড়িয়ে-চলা মেয়েটি এসেছিল আমার ছোট্ট ঘরে—সংসার করতে। দিন কতক যেতে-না-যেতেই বুঝতে পেরেছিলাম, বড়ো ঠাণ্ডা মেয়ে—সাবিত্রী। বিয়ের রাতে বাসর ঘরে সেই যে বলেছিল, আমি কাজকর্ম তেমন জানি না, সে ওর বিনয়। ঝি নয় কিছু নয়, একা ও সংসারের সমস্ত কাজ করে। বলেছিলাম—ঠিকে ঝি রাখি একটা ?

—না। দুটি তো মানুষ আমরা, অতো কেন।

—তোমার কষ্ট হয় না।

অদ্ভুত স্নেহের হাসিতে ভরে গিয়েছিল ওর মুখ। বলেছিল—না গো, আমি যে কী তৃপ্তি পাই, তা তুমি জানো না !

যত্নও করে আমাকে প্রচুর। অফিসে যাবার সময় পায়ের জুতোটি পর্যন্ত যত্ন করে মুছে এগিয়ে দেয়। এক-একদিন বলে, তুমি বোসো তো, আমি পরিয়ে দেই। সাহেব মানুষ, নিজে পরবে কী ?

অফিসের প্রয়োজনে প্যাণ্ট্ পরা শুরু করেছিলাম। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে—সাহেব মানুষ।

জুতো পরিয়ে দেবার অভ্যাসই ও প্রায় করে দিয়েছিল, আমার পুনঃ পুনঃ বাধা দেওয়ায় ও তেমন পেরে ওঠে না এ ব্যাপারে। কিন্তু, দিন রাত ব্যস্ত থাকে সংসারের খুঁটি-নাটি নিয়ে। এটা সাজাচ্ছে, ওটা গোছাচ্ছে, কাজ ওর লেগেই আছে।

এক-একদিন বলি,—সাবি, সিনেমায় যাবে ?

অমনি মুখ ঘুরিয়ে বলে—ছিঃ !

অবাক হয়ে বলি—ছিঃ কী? সিনেমা দেখতেও ইচ্ছা করে না?

বলে—সে আইবুড়ো বেলায় মার সঙ্গে কি দিদিদের সঙ্গে গেছি, এখন আর ও-সব ভালো লাগে না। তার থেকে অফিস থেকে খেটে-খুটে এসেছ, একটু শুয়ে-বসে বিশ্রাম করো, আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

তাড়াতাড়ি টেনে নেই ওর হাত থেকে পা-টা, বলে উঠি—করছ কী! অতো আদর সয় না?

ও উঠে আমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়, মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বলে—কেন গো, ও-কথা বলো কেন?

কোনো-কোনোদিন বলি—চলো, এমনিই না হয় বেড়িয়ে আসি কোথাও। পার্কে-টার্কে—

ঠোঁট উলটে অমনি উত্তর দেয়—ইস্, তাই বই কি! সংসারের কাজকর্ম নেই আমার?

ওর হাত দুটো ধরে বলি—থাক না একদিন কাজকর্ম?

ও ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে, বলে—তুমি বরং যাও, একটু ঘুরে-টুরে এসো।

অন্যদিন হয়ত বলি—চলো, তোমাকে তোমার বাপের বাড়িতে বরং নিয়ে যাই। বাপ-মাকে দেখে চলে আসবে।

তাতেও ওর উৎসাহ নেই। বলে—যাব কেন? বিয়ের পর মেয়েদের অত বাপের বাড়ি বাপের বাড়ি করতে নেই।

অর্থাৎ, কিছুতেই ও বার হতে চায় না। চায় না আমার সঙ্গে যেতে। এ-কথা সে-কথা বলে ঠিক পরিহার করে যায় আমার প্রস্তাব। বিয়ের পর অবশ্য আমার শ্বশুরও তেমন এসে খোঁজখবর নেন নি। ও বলে—বাবার ঐ ধরন, বড়দি-মেজদি-সেজদি,—সেই যে চলে গেছে বিয়ের সময়, আর কি এসেছে কখনো?

হয়ত একদিন তারপরেও বলে উঠি—যাবে সাবিত্রী, দক্ষিণেশ্বরে যাবে আজ?

ও একটু হেসে বলে—না গো, তুমি যাও। বেড়িয়ে এসো। বেটাছেলে, চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকাও ভালো নয়।

ক্রমে ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম সব। ঐ যে একটু খুঁড়িয়ে চলে, ও নিয়ে তার লজ্জা আর সংকোচের শেষ নেই। স্বামীর পাশেপাশে ঐ ভাবে যে হেঁটে চলবে, এটা সে চায় না।

একদিন কথায় কথায় উত্থাপনও করলাম সে প্রসঙ্গ। বললাম—কেন তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাও না, আমি বুঝেছি।

মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো, তারপরে কেমন যেন ভয়-ভয়-করা কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কী বুঝেছ, বলো তো?

বললাম—দেখ সাবিত্রী, তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তোমার চলায় এমন-কিছু কুশ্রীতা ফুটে ওঠে না, যে তা নিয়ে তোমাকে অতো সংকোচ করতে হবে।

বোধহয় একটু লজ্জা অনুভব করল আমার কথায়। মুখ নীচু করে সেটা কাটিয়ে উঠে, আবার তাকালো আমার দিকে, বললে—চিন্তা-ভাবনা করার আর জিনিস পেলে না। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামাও কেন গো!

বললাম—সবাই বউ নিয়ে বেড়ায়, আমার কি ইচ্ছা করে না বউকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাই, কি, লেকের ধার দিয়ে-দিয়ে ঘুরে আসি?

হঠাৎ দেখলাম চোখ দুটি ওর ভরে উঠল জলে, ঠোঁট উঠল একটু কেঁপে, বললে—তেমন ভাগ্য যে তুমি করনি, নইলে, কালো কুৎসিত খোঁড়া একটা বউ জুটবে কেন কপালে?

বলেই, চোখে আঁচল চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল আমার কাছ থেকে। গেল বটে, কিন্তু মনটাকে কেমন যেন উদাস করে দিয়ে গেল মুহূর্তে! বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের মনেই কিছুক্ষণ অনির্দিষ্ট-ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। বাড়ি যখন ফিরে এসেছি, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ওর ততক্ষণে রান্নাবান্না আর গা-ধোওয়া সারা। আমাকে ভাত বেড়ে দিয়ে অদূরে বসল পাখা নিয়ে।

—পাখা কী হবে ?

—ভাতগুলো গরম যে ! টের পাচ্ছ না ?

তারপরে, খাওয়া যখন আমার শেষ হয়ে এসেছে, ও বলে উঠল—আমি তোমার কোনো সাধ-আহ্লাদই মেটাতে পারি না !

কোমল কণ্ঠে বললাম—বোলো না এমন কথা !

উঠে পড়লাম। ও আমার পাতে বসেই খায়। কত বারণ করেছি, কিছুতেই তা শোনেনি। এ-ও বলেছি,—এসো, একসঙ্গে বসে খাই।

—'ছিঃ'—বলে মুখ ফিরিয়ে সরে গেছে।

তাই, ওসব কথাও আর বলি না। আজও আমার পাতে বসে খাওয়া শেষ করে, রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে, যথারীতি পান হাতে নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। আমি করলাম কী, ওর পান-সুদ্ধ হাতখানা ধরে, ওকে টেনে নিলাম কাছে। মুখ বাড়িয়ে পানের খিলিটা ওর মুঠি থেকে মুখে পুরে নিয়ে, তুটি হাতে ওকে ধরে আকর্ষণ করলাম বুকের কাছে। দেহটা আঁকিয়ে বাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াস করতে লাগল, বলে উঠল,—আঃ ! ছাড়ো ! লাগে না ?

কিন্তু, তারপরে, হার স্বীকার করে, বুকের ওপর স্থির হয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হলো আমার, বলে উঠলাম—এ কী ! কাঁদছ ?

বাহুবন্ধন শিথিল করা সত্ত্বেও এবার মুক্ত করল না নিজেকে, সেই ভাবে বুকে মুখ রেখে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল,—এমন কালো-কুচ্ছিতকে অমন করে ভালবাসে কেউ ! অফিসের পরই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসো, মানুষের তো তাস-পাশা-দাবার আড্ডাও থাকে, তোমার তা-ও নেই। বসে আছো, চোখতুটো যেন সব সময় খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি কাছে এলে তবে শান্ত হও। কেন গো ?

বললাম—আচ্ছা, ফর্সা হওয়াটাই কী সৌন্দর্যের মাপকাঠি ? আমার কাছে তো তোমার গায়ের মতো মসৃণ শ্যামলা রঙটাই ভালো লাগে। আর, কুৎসিত ? কুৎসিত তুমি কোথায় ? আয়নায় দেখেছ

ভালো করে, মুখখানা ?

বুকের ওপর ওর গালের পাশটা এক মুহূর্ত সজোরে চেপে রেখে বলে উঠল—যাও, আর ভোলাতে হবে না !

মুখে আর কিছু বললাম না বটে, কিন্তু মন বলতে লাগল,—তুমি যে আমার কতখানি হয়ে উঠেছ, তা তো জানো না ! তোমার মতো শান্ত আর সেবাময়ী মেয়েটিকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলতে পারছি ! মা গেল সেই শৈশবে, আর তারপরে আমার মনের সব আশ্রয়ও চলে গেল ! আরও এক স্নিগ্ধ আশ্রয় আমার জন্য গড়ে উঠছিল, আবার দুরাশার পাখায় ভর করে পাখির মতো স্বপ্নলোকের নিঃসীম শূন্যে ডানা মেলে দিয়েছিল আমার নিপাড়িত অন্তর, কিন্তু হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেল সেই আশ্চর্য পালাগান, যেন আলোকোজ্জ্বল অভিনয়-আসরের সব আলো নিভে গেল অকস্মাৎ ! তারপরে, আবার যে ধীরে ধীরে এক স্নিগ্ধ প্রদীপ শিয়ায়িত হয়ে উঠবে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের একটি কোণে, এ কী কল্পনা করতে পেরেছিলাম কখনো ?

এমনি করে দিন যায়। অফিসে আমি 'গডস্ ম্যান', কিন্তু সংসারে আমি কী ? দুটি প্রাণী একটি ঘর, একটি দাওয়া, একটি রান্নাঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। এখানেও, সাবিত্রীর কাছেও আমি বুঝি 'গডস্ ম্যান', তবে অন্য অর্থে। এখানে আমি ঈশ্বরের মানুষ, হয়ত-বা দেবতাই। ভোরে উঠে আমাকে প্রণাম করে তক্তপোষ থেকে নামে, তাছাড়া, ব্রত-উপবাস, এ তো ওর লেগেই আছে, সেদিনও ওর গলায় আঁচলটা বেষ্টন করে আমাকে প্রণাম করা চাই। এছাড়া, চলতে-ফিরতে পায়ে পা ঠেকলেই, হেঁট হয়ে পায়ে হাতখানা ছুঁইয়ে প্রণাম ও করবেই। বলে,—তুমি ছাড়া আর কে আমার আছে গো ?

একটু তরল কণ্ঠেই বললাম—বাবা রয়েছেন, না ?

বলে—বাবার অবস্থা আমি জানি। নামেই অফিসের বড়বাবু ; উদয়াস্ত গাধার মতো খাটুনিই সার। ধারে ধারে বাবার মাথা বিক্রী।

এর ফলে, বাবা কী রকম যেন হয়ে গেছেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, আর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না। লোকের বাড়িতে কতো তত্ত্বতাবাস আসে, তোমার কপালে তা-ও না!

ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলি—আবার কী তত্ত্ব চাই? সব তত্ত্ব তো একসঙ্গে একবারেই পাঠানো হয়ে গেছে।

সুখানুভূতিতে ওর চোখ দুটি বুজে আসে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরে বলে ওঠে—আমার কিন্তু বড়ো ভয় করে, জানো? এত সুখ আমার সয় না!

—আহা, সুখ তো ভারী!—বললাম—না আছে তেমন গয়না, না আছে তেমন শাড়ি। বাড়িও তো এই, পায়রার খোপ।

—ওগো, এই আমার স্বর্গ!

বলেই, হঠাৎ আমার বুকে মুখ লুকিয়ে, ফিসফিস করে বলে উঠল—হাসপাতালে যাব না কিন্তু, যা হবার এখানেই হবে।

একটু চমকেই উঠলাম কথাটা শুনে। এবং প্রথমদিকে ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝে উঠতেই পারিনি। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—হাসপাতাল। হাসপাতাল কেন? কী হয়েছে তোমার?

সেইভাবে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে আমার বুকের ওপর। অল্প একটু হেসে, ঝংকার দিয়ে বলে উঠল—যাও! বুঝতে পারছেন না যেন!

ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে যেন এলাম আলোকে। অদ্ভুত এবং অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দ যেন হঠাৎ উদ্বেল তরঙ্গের মতো উত্তাল হয়ে উঠল অন্তরে, শুয়ে ছিলাম, উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। ওর দুটি কাঁধে দুটি হাত রেখে বলে উঠলাম—সত্যি?

লজ্জা পেয়ে আবার মুখ লুকাল আমার বুকে। তারপরে বহুক্ষণ—বহুক্ষণ নীরবতার মধ্য দিয়ে ঐ ভাবে কেটে যাবার পর, কেমন যেন ভারী গলায় বলে উঠল—যদি আমি না বাঁচি?

ঈষৎ তিরস্কারের সঙ্গে বলে উঠলাম—ও কী কথা!

ও বললে—ও রকম হয় গো। আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে, রুবিদি বলে আমরা ডাকতুম, ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল হাসপাতালে। ছেলেটাও বাঁচেনি, কী ফুট্‌ফুটে হয়েছিল গো ছেলেটা, আমরা সব দেখতে গিয়েছিলাম! কোঁকড়া-কোঁকড়া কেমন চুল মাথায়! কেমন নাক! কেমন চোখ! অয়েলক্লথমোড়া টেবিলের ওপর পড়ে আছে, মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে আছে।

ওর কথা শুনতে শুনতে আমার মনটাও কেমন যেন এক প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে ধীরে ধীরে ভরে গেল। মনে হলো, সত্যিই তো, আমার যা ভাগ্য শেষ পর্যন্ত ও-ও যদি হঠাৎ ছেড়ে চলে যায় আমাকে! এই চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ হলো এই যে, ওকে আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই সজোরে চেপে ধরলাম বুকের ওপরে। একটু বুঝি হাঁপিয়ে উঠল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—কী হলো!

তারপরেই, অপূর্ব এক স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ। বললে—এই দেখ! অমনি ছল্‌ছল্ করে এসেছে চোখ!

হাত বাড়িয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে উঠল—এই বুঝি পুরুষমানুষ! না গো, আমি মরব না! তোমাকে ছেড়ে আমি যাব কোথায়?

তারপরে, দেখতে দেখতে কেটে গেল দশটি মাস। ও বলতো—দেখো, ছেলে হবে। ঠিক তোমার মতো।

হেসে বলতাম—আমার মতো! আমি খুব সুন্দর নাকি?

—নও!—দুটি চোখ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠত, বলতো—মা একটা কথা বলেছিল বিয়ের সময়। বলেছিল—ঠাকুর-দেবতার মতো মুখ!

হাসতাম মনে মনে। তবে এটুকু বুঝলাম, ও-ও যেমন আমার একমাত্র আশ্রয়, আমিও তেমনি ওর একমাত্র আশ্রয়। ভালবাসা অসুন্দরকেও সুন্দর করে দেখে। তাই, আমার মতো অতি সাধারণ মানুষও ওর কাছে অসাধারণ—সুন্দর!

বলতাম—আমার কি মনে হয় জানো? ছেলে নয়, মেয়ে হবে।

—ইস্‌ !

—ইস্‌ নয়, ও পেটে আসবার পর তোমার চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে, তা জানো ?

মুখ টিপে হেসে বললে—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ গো। এ অবস্থায় মায়ের চেহারা সুন্দর হলে, কী হয় ? মেয়ে হয়।

হেসে উঠল খিল খিল করে, বললে—এসব মেয়েলি কথা তুমি আবার শিখলে কোথা থেকে ?

—শুনেছি।

কিন্তু, ছেলে নয়, মেয়েই এলো ওর কোলে। হাসপাতালে ও যেতে চায়নি। ওর বাপ-মা নেবার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করলেও ওকে ওখানে পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিছুতেই যেতে চাইনি। অথচ, বাড়িতে, এইটুকু ঘরের মধ্যে আমি কোনোকিছু করতে ভরসাও পাইনি। জোর করে হাসপাতালেই দিয়ে এসেছিলাম। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তবু আমার হাতটা ধরে বলছে,—যেও না তুমি, কাছে থাকো। কিন্তু, তাই কি হয় ? কয়েক ঘণ্টা একাকী ওকে ওর কষ্ট ভোগ করতে হবে বই কি !

হাসপাতালে প্রথম দেখা করবার অনুমতি যখন পেলাম, তখন দেখা হতেই আমাকে বললে—শেষ পর্যন্ত সত্যিই মেয়ে হলো !

হাসতে লাগলাম, বললাম—বলিনি আমি !

ও বললে—ভালো করে দেখ তো, রঙ্‌টা লাল দেখাচ্ছে কি না ? লাল দেখালে কালো হবে।

পাশেই, ছোট্ট একটা দোলনায় পুতুলের মতো একটা জীব ঘুমুচ্ছে। নার্স'রা এদিকে তৎপর আছেন, মুখে পাউডার দিয়ে, কপালে একটা কাজলের ফোঁটা ছুঁইয়ে গেছেন। বললাম—না, লাল দেখাচ্ছে না। সাদা দেখাচ্ছে। ও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বলল—যাক, তোমার রঙ্‌টা পেয়েছে, আমারটা পায় নি।

তারপরেই, ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল—ওগো, দেখ তো ভালো করে পা দুটো, খোঁড়া নয় তো ?

—না গো না।

—দেখই না তুমি !

কিন্তু, আমার কথাতেও আশ্বস্ত হচ্ছে না। দিন দশেক পরে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে যখন মেয়েকে নিয়ে বাড়ি এলো, তখনো ঐ প্রশ্ন,—হ্যাঁগো, খোঁড়া-টোঁড়া হবে না তো আমার মতো ? রঙ্ কালো হবে না তো ?

বছর খানেক কেটে গেল তারপর এইভাবে। এর মধ্যে খুকুর দাঁত ওঠবার সময়, কালী-বাড়িতে প্রতিবেশীদের একটি ছেলেকে পাঠিয়ে পুজো দিয়েছে, সেই পুজোর সন্দেশ ওর মুখে ছুঁইয়ে, ওকে একখানা নতুন-কেনা ছোট চেলীর কাপড় পরিয়ে কপালে গালে লবঙ্গ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা এঁকে, মুখে ভাতের কাজটা সম্পন্ন করে নিয়েছিল সাবিত্রী। ও না বললেও, নিজে থেকে আমি শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বলে এসেছিলাম সবাইকে। শাশুড়ী রুগ্ন মানুষ, আসতে পারলেন না, ছোট শালীটি মাকে দেখাশোনা করে বলে সে-ও এলো না, এলেন হীরালালবাবু নিজে। পাঁচটা টাকা দিয়ে নাতনীর মুখ দেখে চলে গেলেন, বেশীক্ষণ বসলেন না পর্যন্ত। মেয়েকে বললেন—তুই তো ভালোই আছিস, এখন তোর বোনের জন্য পাত্র দেখে বেড়াচ্ছি।

—ওমা, ওর এখন বয়স কী ?

—তা হোক !—শ্বশুর বললেন—এখন থেকে খোঁজখবর করা শুরু করে দিয়েছি।

আশ-পাশের এবং বাড়ির যে দু'চারজনকে ও বলেছিল, তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যাবার পর, যখন সব কিছু মিটিয়ে, আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারছি, তখনো ওর সেই আগের চিন্তা কাজ করে চলেছে। তবে এতদিনে ও বোধহয় একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছে। বললে—যাক, খোঁড়াও হয়নি, কালোও হয়নি। সবাই বলছে,

বাপমুখী মেয়ে হয়েছে। রঙ্‌ও সবাই বলছে তোমার মত ধব্‌ধবে হয়েছে। ভগবানই পাঠিয়েছে ওকে। হ্যাঁগো, ওর কি নাম রাখবে বলো তো ?

কৌতুক করে বলে উঠলাম—ধবধবে রঙ যখন, তখন ওর নাম রাখো—ধবলা।

—ছিঃ ! ধবলা আবার একটা নাম নাকি ?

—তবে ?

ও একটু ভেবে বললে—আমি রাখব একটা নাম ?

—রাখো দেখি ?

ও বললে—গৌরী।

—সেকেলে নাম।

বললে—তা হোক সেকেলে ! হ্যাঁগো, তোমার পছন্দ নয় বুঝি নামটা ?

হেসে ফেললাম। তারপরে, ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলে উঠলাম—খুব পছন্দ। দাক্ষায়নী, দক্ষিণা, এসব নাম যে রাখনি, এই-ই ঢের !

মাগো, ওসব কি নাম নাকি ?

—নয় !—বললাম—সুদক্ষিণা কেমন নাম ?

একটু যেন ভাবল, তার পরে বললে—এটা কিন্তু ভালো নাম। এটাই রাখবে নাকি ?

দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলাম—না।

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে বোধহয় একটু চমকেই উঠে থাকবে সাবিত্রী, বললে—অমন করে বললে কেন !

পর মুহূর্তেই সামলে নিয়েছি নিজেকে। ভাবছিলাম, হাস্য-পরিহাসের অবকাশে এই নামই বা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কেন ?

বললাম—ও কিছু নয়। গৌরী নামই ভালো। ওটাই থাক।

সংসারের রথচক্র আবার আবর্তিত হতে লাগল যথা নিয়মে। দুশো টাকার সংসার সচ্ছলভাবে চলতে পারে না আজকাল। কোনক্রমে চলে যায়, এই পর্যন্ত। সাবিত্রীর মতো গুছোনো মেয়েই পারে এই সংসারের হাল ধরে রাখতে। দুটি প্রাণীর সংসার, কিন্তু টুকরো কাজ ওর দেখতাম লেগেই আছে সব সময়। তার ওপরে এখন এই মেয়ে। ওকে স্নান করানো, খাওয়ানো-দাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সে এক রীতিমত খাটুনির ব্যাপার! ঐ ভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর, দাওয়া আর রান্নাঘর করছে অনবরত, দেখে খুব মায়া হতো। বলতাম লোক রাখি একটা?—ও মা, কেন! ঠিকে ঝি-ই তো রয়েছে!

বলতাম—এই বাচ্চার সব-কিছু সামলানো, এ কী সোজা কথা?

বলতো—কী আর করছি! ও তো 'বাপ-অন্ত প্রাণ' মেয়ে! অফিসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, আর তারপরে অফিস থেকে ফিরে এলে, ও তো তোমাকে ছাড়তেই চায় না! আমার আর তখন কী কাজ বলো!

যাকে বলে 'বিনয়,' এ ওর তাই। থাকে বটে ঐসব সময়ে আমারই কাছে, কিন্তু শিশু তো, মাকে যে ওর কতবার কত ভাবে দরকার হয়, তার কি ইয়ত্তা আছে?

সুখে দুখে একরকম করে সংসার চলে যায়। গৌরী হাত বাড়িয়ে ডাকে—বাব্বা! মাকে ডাকে—ম্মা! —এ ছাড়া, তার যে সব ভাষা আছে, তা বোঝার আশা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি! কিছু খাবার দেখলেই বাড়িয়ে দেয় ছোট্ট ছোট্ট মুঠি দুটি, বলে—দ্যা! থপ্ থপ্ করে কেমন হেঁটে বেড়ায়, যেন টলে-টলে চলে,—আমাদের গৌরী। গোটা চার কি পাঁচ দাঁত উঠেছে, সুযোগ পেলেই সে দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। যতটা লাগে, তার থেকে বেশী করে কৃত্রিম যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠি—উঃ! মাগো!

ছেড়ে দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে গৌরী, তারপরে একটুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে এসে, আমার কাছে দাঁড়িয়ে গায়ে হাত বুলাবার মতো

ক'রে বলে—আ-আ—ছাত্-ছাত্ !

'ছাত্ত-ছাত' অর্থ—'ষাট্-ষাট্ !'

সাবিত্রী সব দেখে-শুনে হাসে, বলে—বাপ-মায়ের কাণ্ড দেখে হেসে মরি ! এমন বাপও কারুর হয় না, এমন মেয়েও কারুর হয় না।

বললাম—এমন মেয়ের মা-ও তো দেখি হয় না !

—ও মা, কেন ?

বললাম—সব সময় এটা-ওটা কাজ নিয়ে আছ, একটু যে কাছে বসে গল্প করবে, সেটুকু ইচ্ছাও করে না বুঝি ?

পাশে বসে, আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে, কোমল কণ্ঠে বলে ওঠে—করে গো করে ! মনে মনে ঠাকুরকে কী বলি জানো ? বলি, ঠাকুর, এ যা দিয়েছ, এর থেকে আমার কিছু যেন আবার কেড়ে নিও না।

চুপচাপ শুনে যাই ওর কথা। সবই ভালো, কিন্তু এমন এক দুর্ভাগা মানুষের সঙ্গে ওর জীবন জড়িয়ে গেছে যে, তার কাছ থেকে সুদীর্ঘকালের সচ্ছলতা আশা করা বৃথা।

অফিসে ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। আমার বাইরে বাইরে ঘোরার কাজ, এ বিষয়ে অতটা মনোযোগ দেবার অবসর ছিল না। যারা আমাকে 'গড্স্ ম্যান' বলে কৌতুক অনুভব করত, ক্রমে ক্রমে দেখলাম, তারাও নীরব হয়ে গেছে। শুধু একজন, একদিন হঠাৎ আমার মুখের দিকে মুখ তুলে বললেন—You are no more a god's man !

—মানে।

আর কিছু বললেন না ভদ্রলোক, মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের কাজে মন দিলেন।

কিন্তু, যা কোনদিন ভাবিনি, মনের কোণেও যে আশঙ্কার কালোমেঘ কোনদিন দেখা দেয় নি, তা-ই হয়ে দাঁড়ালো। অফিসের

অবস্থা খারাপ, ব্যবসাপত্রের অবস্থা সুবিধের নয়, 'মার্কেট ডাউন'—এসব শুনে আসছি, কিছু ছাঁটাই হতে পারে, এ-ও আশঙ্কা করছেন অনেকে, কিন্তু তা বলে, আমিই যে সে আকস্মিক বন্যার মুখে পড়ব, এ আমি ভাবতেই পারি নি। অথচ, যা মানুষ ভাবতে পারে না, তা-ও হয়। ছাঁটাইয়ের মুখে পড়লাম আমি। নোটিশটা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলাম মনে আছে। তারপরে কে যেন বললে—যার 'মানুষ' তার কাছে যাও না ? বড়বাবুর কাছে যাও না ?

যন্ত্রচালিতের মতোই গিয়ে দাঁড়ালাম আমি ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মশায়ের সামনে। বললেন—যথেষ্ট চেষ্টা করেছি তোমাকে রাখতে। বলেছি, কাজকর্মে ভালো, খাটিয়ে ছেলে, হুঁসিয়ার ছেলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা ? বললে—ঠিকানা রেখে দাও, আবার সুযোগ সুবিধা হলে ডাকা যাবে। এর ওপর আর কোনো কথা নেই। মনে মনে বলছিলাম—ততদিনে ও' খায় কী ? কী আর করব বলো, আমারও হাত-পা বাঁধা। তোমার শ্বশুরকে টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছি। আজ নয়, দুদিনে আগেই জানিয়েছি। দেখ, যদি তিনি এবার নিজে কিছু করতে পারেন তোমার জন্য।

মাথা নীচু করে সরে এলাম। দু'এক-জন আমার সমবয়সীও ছিলেন অফিসে। সেই ভদ্রলোক, যিনি ইংরেজীতে কথা বলতে ভালবাসেন, তিনি আমার হাত ধরে ছলছল চোখে বললেন—তুমি এখন আমাদেরই মতো man's man—শয়তানের লোকও নও, ভগবানের লোকও নও, মানুষের লোক। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যদি কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারে, তোমার আমারও অবস্থার উন্নতি হবে। আর, তা' যতদিন না হয়, ততদিন, এ-দরজায় ও-দরজায় ঠোক্কর খেয়ে বেড়াও। সিকিওরিটি কোথাও নেই। তুমি যাচ্ছ আজ, আমি যাব কাল। প্রতিদিন রাত্রে দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না, কাল অফিসে গিয়ে দেখব তো, যে, চাকরীটা আছে ? বলবে, গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে নিশ্চিন্ততা আছে ? তা-ও নেই। যতকিছু আইন

হোক না কেন, যে যতো বড়ো কথাই বলুক না কেন, সেখানেও ঐ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এর মধ্যে ভরসার কথা হচ্ছে এই, যে, কর্মক্ষেত্রে যদি ভাগ্যক্রমে কোনো ভালো লোকের আওতায় গিয়ে পড়ো, তাহলে কিছুটা স্বস্তি পাবে। ব্যবহারিক বুদ্ধি-কে মাত্র সম্বল করে যারা পথ চলে, তাদের কথা আমি বলছি না, আমি বলছি তাদের কথা যারা আজও হৃদয়ের নির্দেশে জীবনকে চালিত করবার চেষ্টা করে। এরা আছে, কোথাও না কোথাও এরা আছে, নইলে এতদিনে পৃথিবী থাকত না, ধ্বংস হয়ে যেতো!

অর্থাৎ, আরও একমাস পরে সত্যিসত্যিই চলে গেলো আমার চাকরীটা। এর মধ্যে আরও চেষ্টা করেছি, শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেও সব বলেছি, কিন্তু, কোনো দিগন্তে কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। আবার আমি বেকার। কিন্তু, সে বেকারত্বের সঙ্গে এ বেকারত্বের আছে প্রভূত তফাৎ। তখন ছিলাম একা, এখন আর তো একা নই আমি!

সঞ্চয়ও কিছু নেই যে, তাই ভেঙে চালাবো। বাড়ি ভাড়া, খুকীর দুধ,—দৈনন্দিন সমস্ত খরচই রয়েছে। ভেবে-ভেবে আমি যেন চোখে অন্ধকার দেখলাম।

সাবিত্রী কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে—ভাবছ কেন? এতো ভেবো না। আমার চুড়ি-হার-দুল রয়েছে তো?

ওর মুখের দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকালাম, বললাম—কী হবে তাতে!

সাবিত্রী পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল, বললে,—ওমা, দুঃসময়ের জন্যই তো এসব! দায়ে-অদায়ের জন্যই তো গয়না! নাও তুমি, লক্ষ্মীটি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম—কিন্তু, তাতে আর চলবে কদিন?

ও বললে—যতদিন চলে চলুক, এর মধ্যে তোমার একটা কাজ জুটে যাবেই।

বললাম—তার চেয়ে তুমি একটা কাজ করো সাবিত্রী, দিনকতক

বাপের বাড়ি গিয়ে থেকে এসো।

কোনো উত্তর করল না সে। বসে রইল মুখখানা নীচু করে। তারপরে ছুটো চোখ দেখতে দেখতে ভরে উঠল জলে।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—এ কী, কাঁদছ কেন?

এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল সাবিত্রী, বললে—তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ওখানে পাঠিও না।

ধীরে ধীরে ওকে টেনে নিলাম বুকের কাছে, সস্নেহে। ও বললে—আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

বললাম—তা' আমি বুঝি। কিন্তু, কী করা যাবে, বলো!

ও বললে—তোমার চাকরি নেই, এ অবস্থায় বাপের বাড়ি গিয়ে থাকা যে কা হীনতা স্বীকার করা, তা তোমাকে আমি কী করে বোঝাবো? আমাকে পাঠিও না তুমি!

বললাম—বেশ।

ও ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠল—রাগ করলে? রাগ কোরো না। আমি দেখতে কুচ্ছিৎ, দিনরাত বাপের বাড়িতে লাঠি-সোঁটা খেয়েছি। বাপের আদর পাইনি, মায়ের আদরও না। কী জানো? এ-ও হয়। আমাকে তো 'হতচ্ছাড়ী' 'মুখপুড়ী' ছাড়া কেউ কোনোদিন ডাকতই না!

বললাম—ঠিক আছে। এখানেই থাকো। যা হবার হবে।

ও আচলে চোখ মুছে, আমার দিকে আবার ফেরালো মুখ, ভারী তৃপ্তির একটা হাসি ফুটে আছে মুখে! বললে—দিনরাত আমি ঠাকুরকে ডাকব। দেখো, চাকরি তুমি শিগাগরই পাবে।

তারপরে কিছুটা আত্মগতভাবেই বলতে লাগল—সাধে যেতে চাই না বাপের বাড়ি? গৌরী হলো, বাবা একবার মাত্র এসে পাঁচটি টাকা দিয়ে নাতনীর মুখ দেখে গেলেন! মা, বা বোন, বা দিদিরা তো আসেইনি। বাবা আমাকে নিয়ে যাবার কথাটুকুও পাড়েননি! চিরকালই বাবা ঐরকম! মেয়ের যেই বিয়ে হলো, অমনি সে পর হয়ে গেল। আর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বড়দি, মেজদি,

সেজদি—কাউকে আনায় না।

কিন্তু, সাবিত্রীর কাহিনী যাই হোক না কেন, শুরু হলো সেদিন থেকে আমার কৃচ্ছ্র সাধনার দিনগুলি !

সাবিত্রীর দুল গেল, হার গেল, চুড়িগুলিও একে একে চলে গেল, তবুও কোনো দিগন্তে কোনো চাকরির ঊষাকালের আভাস নেই। অর্থের অভাবে যেদিন মুড়ি খেয়ে দিন কাটালাম, সেদিনও ওর মুখে আশ্বাসের বাণী,—কিছু ভেবো না, এ-সব ঠাকুরের পরীক্ষা। চাকরি তুমি এবার ঠিক পাবে, দেখো।

সত্যিই আশ্চর্য মানুষ ও। একটি দিনের জন্য গঞ্জনা দেয়নি, একটি দিনের জন্যও হতাদর করেনি। হাসিমুখে সব সহ্য করে চলেছে।

ওর দুঃখ তবু সওয়া যায়, কিন্তু ঐ দু'বছরের মেয়ে গৌরী, ওর শুকনো মুখখানা দেখলে পাষাণের বুক ফেটেও বুঝি জল আসে ! অবুঝ, অতৃপ্ত পিতৃহৃদয় নিয়ে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু, কোথায় চাকরি ?

শ্বশুরের কাছে আবারও গিয়েছিলাম। বললে—বিয়ের সময় চাকরি করে দিয়েছিলাম কষ্টেসৃষ্টে। সেটা যখন রাখতে পারলে না, আমি আর করব কী ? আমিও তো রিটায়ার করব দু'দিন বাদে, মাথার ওপরে একটি মেয়ে এখনো পার করতে বাকী। তোমরা ভেবেছ কী আমাকে, কল্পতরু ? সে দিনকাল নেই হে, চাকরির বাজার বড়ো মন্দা ! আর সাহায্য ? স্বয়ং ভগবানও এ-যুগে কাউকে, কোনো সাহায্য করতে পারবেন না ! এ হচ্ছে 'পরিকল্পনা' যুগ, ভবিষ্যতের মানুষ যাতে সুখে থাকতে পারে, সে-চেষ্টাতেই কর্তারা সব ব্যস্ত, আজকের মানুষ তোমরা চুলোয় যাও না, তাঁদের কী ?

ঘরে ফিরলে সাবিত্রী বলে—চেহারা কী হচ্ছে দিন দিন দেখছ ? ধুতিটাও ছিঁড়ে গেছে। এসো, ওটা সেলাই করে দি।

আমার মাথার চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বলে—এতো ভেঙে পড়ো না লক্ষ্মীটি। তুমি ছাড়া আমার আর গৌরীর কে আছে বলো !

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সাবিত্রী।

কিন্তু, কতটুকু ওকে বোঝাবো? বেকারত্বের জ্বালা যে পুরুষের পক্ষে কত মর্মান্তিক, তা ওরা ঠিক কতখানি পারবে বুঝতে?

গৌরী ছোট ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে দেয়, বলে—বাবা, চকো—

চকোলেট খেতে চায় শিশু। আর, অক্ষম, হতভাগ্য বাপ আমি মুখ ফিরিয়ে চলে আসি বাইরের দিকে।

এইসব দুঃসহ দুর্যোগেরই একটি দিনে, সারাদিন আহার নেই কিছু নেই, সেই উত্তর কলকাতা থেকে পয়সার অভাবে হেঁটে হেঁটে গেছি কালীঘাটে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে একটা কাজের ধান্দায়। কেউ যখন কোনো সাহায্যই করতে পারল না আমায়, তখন সোমেশ্বরপ্রসাদের পূর্বতন অফিসে গিয়ে ওর বম্বের ঠিকানা বার করে, সব কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম ওকে। আগেকার মানুষ হলে হয়ত কোনক্রমে গাড়ি-ভাড়া জোগাড় করে সোজা চলে যেতাম বম্বে, ওর কাছে। যে-সময় সাবিত্রীর গয়না বিক্রী করে সংসার চালিয়েছি, সেই সময়ই চলে যেতাম। শশীর কাছে যেমন গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, তেমনিই হতো আর কী ব্যাপারটা! কিন্তু, শশীর সেই পাংশু মুখখানা বারে বারে সেদিন ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। যেন বলছে—হ্যাঁরে, আত্মীয়স্বজনরা এখনো আমার নাম করে?

যাইনি সোমেশ্বরের কাছে, লিখে দিয়েছিলাম চিঠি। জানি না, সবাই যখন মুখ ফিরিয়েছে, ও-ও মুখ ফেরাবে কি না। কিন্তু না, চিঠি এলো। লিখেছে—"ভাই, তোমার সব কথা শুনে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। তবে, ভাবনার কিছু নেই, আমারও আজ তোমার মতো অবস্থা। অবশ্য, বলতে পারা যায়, আমার আজ এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। বম্বেতে এসে দু-চারজন বন্ধু জুটে গেল। তাদের পরামর্শেই বলতে পারো, চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দিলাম। দিয়ে, ব্যবসা করা শুরু করলাম। আমি একথা বলতে চাই না যে, বন্ধুরা

আমাকে ঠকিয়েছে। ঠকায়নি, তারাও আমার সঙ্গে সমানে খেটেছে। কিন্তু, মুসকিল হচ্ছে এই যে, এত সতর্ক হয়ে কাজে নেমে পড়লেও শেষরক্ষা করা গেল না। সব কথা চিঠিতে লেখা যায় না, তবে এটুকু বুঝেছি, আমাদের মতো অল্প মূলধন নিয়ে আজকালকার দিনে যারা ব্যবসা করতে নামবে, বিপুল পুঁজি নিয়ে যারা নেমেছে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো শক্ত। কন্‌ট্রাক্‌টরির ব্যবসাই তো করতে গেছলাম, কিন্তু একদিকে নীচু রেটের টেণ্ডার দিয়ে কাজ পাওয়া, অন্য দিকে শ্রমিক নিযুক্ত করে যে কাজ চালাবো সুষ্ঠুভাবে, তার উপায় নেই। যখন-তখন ধর্মঘট। একদিকে পুঁজিপতিদের সমবেত শক্তি, অন্যদিকে শ্রমিকদের সমবেত প্রতিরোধ,—মাঝখান থেকে আমরা মরলাম পিষে, যাঁতাকলে। অতএব, ফল যা হয়, তা বুঝতেই পারছ? প্রচুর ঋণ মাথায় নিয়ে আমরা ক'বন্ধু সম্পূর্ণ বেকার হয়ে বসে পড়েছি। তবে এটাও তোমাকে বলে রাখি পরমেশ, আমি হারব না, উঠে আমি দাঁড়াবোই। সেদিন তোমাকেও টেনে আনব কাছে, তা সে যেরকম করেই হোক। আসলে জাত ব্যাপারটা অন্য অর্থে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক কারণ এসে উপস্থিত হয়, তখনই তার ফলস্বরূপ একটা কৃত্রিম বিভেদ দেখা দেয়, এ হিন্দু, ও অ-হিন্দু। অথবা, এ বাঙালী, ও বিহারী, সে মাদ্রাজী—এইসব। নইলে, যেটা রূঢ় সত্য, সেটা হচ্ছে এই,—আজ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তিনটি জাত এসে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিপতি, শ্রমিক আর আমরা। এই আমাদের তুমি কি সংজ্ঞা দেবে? পুঁজিপতিদের কাছে আমাদের ঠাঁই নেই, শ্রমিকরাও আমাদের সন্দেহের চোখে দেখে। তুমি-আমি তাহলে বাঁচব কী করে, পরমেশ? ঐ মাথা খাটিয়ে নানান কৌশল করে—উঞ্ছবৃত্তি করে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, একে কি বেঁচে থাকা বলে? এ যে এক মরামানুষের সমাজ হয়ে দাঁড়ালো আমাদের! কী বলো, ঠিক আমাদের মতো মানুষদের যে গণ্ডি হয়েদাঁড়িয়েছে, সেটা মরামানুষদের গণ্ডি নয়? কিন্তু থাক, বক্তৃতাটা থাক। এসব তোলা রইল। তুমি এক

কাজ করো, আমার এক বন্ধু আছে, তাকে তোমার সঙ্গেই একটা চিঠি দিলাম, ঠিকানা রইল চিঠিতে, কালীঘাটে সে থাকে। গিয়ে তার সঙ্গে এই চিঠি নিয়ে দেখা কোরো। 'Queer Trade' বলে ইংরেজীতে একটা কথা আছে, নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। আমার এই বন্ধুটি স্কুল-কলেজের বইগুলির নোট লেখে। ওর নিজের নাম থাকে না, থাকে হয়ত এমন লোকের নাম, যে বহুদিন আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। সেই বন্ধু আবার নিজেও লেখে না। ধরো, ইংরেজী সিলেকসনের নোট। কেউ লেখে গ্রামার পোর্‌সন, কেউ লেখে সাবস্‌ট্যান্স, কেউ লেখে অনুবাদ অংশটা। এজন্য কী-সব যেন রেট আছে,—তোমার যেটা সুবিধা হয়, সেটা করে দিও। অবশ্য, এ কিছুই নয়, কিন্তু যতদিন না তুমি নিজে চাকরি পাচ্ছ, বা আমি দাঁড়াতে পারছি, ততদিন এটা করে, অন্ততঃ তোমার বাচ্চাটার দুধের সংস্থানটুকুও করতে পারবে আশা করি।"

স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডটি ধরব বলে কালীঘাটে এসেছিলাম সোমেশ্বরের সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু, দুর্ভাগ্য আমার, এতটা হেঁটে এসেও সুফল কিছু মিলল না। শুনলাম, বাড়িতে নেই ভদ্রলোক।

হতাশ হয়ে ফিরে আসছি একটি গলিপথ ধরে। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেছে। সারাদিন ধরে কিছুই তো পেটে পড়েনি, পেটের ভিতরটা কেমন গুলিয়ে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন লাগছে সমস্ত শরীর। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি নির্জন গলিটা দিয়ে। 'থালা-বাসন' বলে হাঁক দিয়ে চলে গেল একটি লোক, সঙ্গে ঝাঁকা মাথায় আর একটি লোক। 'পুরনো শিশি-বোতল!' বলে হাঁক দিয়ে চলে গেল আরও একটি লোক। কিন্তু, কোনো বাড়িরই কোনো দরজা বা জানালা খুলল না। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে গলিটার ওপরে।

চলতে চলতে হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, মনে হচ্ছে, চারিদিকের সমস্ত আলো হঠাৎ নিভে আসছে! কেমন যেন একটা আতঙ্কও হলো, মনে হলো চীৎকার করে ডেকে উঠি—সা-বি-ত্রী!

কণ্ঠেও স্বর ফোটে না, আর তাছাড়া, কোথায় কে? কেমন যেন কষ্ট হলো সাবিত্রী আর খুকীর জন্য। আমি যদি হঠাৎ চলে যাই, ওদের কী হবে? ততক্ষণে চোখে আঁধার লেগে, মাথায় হাত দিয়ে নির্জন গলিটার একটা জানালা-দরজা-বন্ধ বাড়ির চত্বরে চুপচাপ বসে পড়েছি। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠছে, সারা অঙ্গ যেন শিথিল হয়ে গেছে! মস্তিষ্ক, হাত-পা, কোন-কিছুই যেন আমার আর বশে নেই! মনে হলো, চোখের সামনে শেষ আলোর রশ্মিটুকুও বুঝি মিলিয়ে যাচ্ছে!

ওভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎ, দূরাগত কোনো বাঁশির স্বরের মত কানে ভেসে এলো,—জামাই!

চমকে উঠলাম।

—জামাই?

এবারে একেবারে স্পষ্ট! একেবারে কানের কাছে!

চেয়ে দেখি,—তাঁরা। ততক্ষণে আমি বোধহয় একটু সামলে নিয়েছি, নইলে লোক চিনতে পারছি কেমন করে? আলো যেন আঁধার হতে হতে হঠাৎ এক যায়গায় এসে থেমে গেছে। আবছা হলদে হলদে একটা আলোর আভা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে আছে চারিদিক জুড়ে। সেই আলোয় ভালো ক'রে চোখ মেলে দেখলাম। আরও বৃদ্ধ হয়েছেন, আরও জরাজীর্ণ। জামাকাপড় খুব ময়লা না হলেও—ছিন্নবিচ্ছিন্ন বলা যেতে পারে।

অতুলবাবুর হাতে লাঠি আর কাঁধে একটা ঝোলামতন। আমার পাশে, সেই চত্বরেই বসে পড়লেন ওঁরা। ওঁদের কথাও শুনলাম সব। অনেকদিন হলো, ওঁদের বাড়িওয়ালা তাড়িয়ে দিয়েছেন ওঁদের। এক-জনের বাড়ির ভিতরের রোয়াকে রাত্রে শুতে যান, সেইখানেই থাকে

ওঁদের কাঁথাটাথা, আর সারাটা দিন ওঁরা ঘোরেন এ-অঞ্চলে—গৃহস্থের দোরে দোরে। ঝোলার ভিতরে 'ঠাকুর' আছেন, তাকে দেখে যে যা দেয়, তাতেই চলে যায়।

অতুলবাবু বললেন—বেশী ঘুরতে হয় না বাবা। এদিককার সবাই আমাদের ভালোবাসে।

আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে বৃদ্ধা কখন বুঝি উঠে গিয়েছিলেন চত্বর থেকে, ঠিক লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ এক সময় তাকিয়ে দেখি, একটা শালপাতায় করে গোটা দুয়েক 'প্যাড়া' নিয়ে এসে আমার সামনে ধরেছেন, সেই অপূর্ব স্নেহমণ্ডিত মুখের ভাব। বলছেন —খাও বাবা!

চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো মুহূর্তে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বৃন্দাবনের কথা। 'তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী বুঝি না খেয়ে মরে যাবে। ওদের কিছু অর্থ সাহায্য করা দরকার।'

আমি উত্তরে বলেছিলাম—'কে কোথায় না খেয়ে মরছে, তা দেখতে গেলে আর দিন চলে না।'

আজ মনে হচ্ছে, কোনদিন কিছু ওঁদের দিতে পারিনি, শুধু দুহাত পেতে নিয়েই গেলাম। আজও সেই নেওয়ার পালা। কম্পিত হাত পেতে সন্দেশ দুটি নিলাম। বললাম—এ আমি বাড়ি নিয়ে যাই।

—কেন বাবা, ওটুকু তুমিই খাও। আমি একটু জল এনে দিচ্ছি।

—না মা!—আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললাম—এ আমার গলা দিয়ে নামবে না। বাড়িতে আমার দু-বছরের বাচ্চা মেয়েটা উপোস করে আছে।

দুটি মুখ যেন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল। একে একে সব বললাম। বিবাহের কথা বললাম, কন্যার কথা বললাম, চাকরি যাবার কথাও বললাম।

কাঁদতে লাগলেন মহিলাটি। অতুলবাবুকে বললেন—তুমি চুপ করে বসে থাকবে? জামাই-মেয়ের এই অবস্থা, তুমি কি কিছু

করবে না?

—অ্যাঁ—যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন অতুলবাবু, তারপর বললেন—হ্যাঁ। বলো, তোমার বাসা কোথায়, বাবা?

বললাম—সেই শ্যামবাজার।

—তা হোক, আমরা যাব। চলো বাবা।

ঝুলি হাতড়ে বোধহয় পাঁচসিকের মতো পয়সা পেলেন ওঁরা। বাস-এ করে আমায় নিয়ে এলেন ওঁরা বাড়ি। মহিলাটি নিজেই জোগাড়যন্ত্র করে উনুনে আঁচ দিয়ে, ঝোলা থেকে ভিক্ষার চাল বার করে, সেই আমাদের রান্না করে খাওয়ালেন।

সাবিত্রীর মুখখানা ধরে মহিলাটি দেখালেন অতুলবাবুকে, বললেন—মেয়ের মুখখানা দেখো! কেমন শান্ত, লক্ষ্মীশ্রী ফুটে রয়েছে। নাতনীকে কোলে নিয়ে একটু আদর করো। ভাগ্যবান তুমি, নাতনীর মুখ দেখে গেলে।

সন্ধ্যা হবার আগেই ওঁরা চলে গেলেন। সাবিত্রী বোধহয় এতো স্নেহ জীবনে পায়নি। ও কেঁদে ফেলল। বললে—থাকবে না মা, মেয়ের কাছে?

—না মা, আমাদের যেতেই হবে। আবার আসব। মেয়েকে ছেড়ে মা-বাবা কি বেশী দিন থাকতে পারে?

ওঁদের বাস-এ তুলে দিয়ে ফিরে এসেছি। সাবিত্রী বললে—এখনো কতো চাল, আলু, এইসব পড়ে রয়েছে। ঝুলিসুদ্ধ সব দিয়ে গেলেন। কালকের দিনটা হেসে-খেলে চলে যাবে।

পরের পরের দিন আবার এলেন। আজ শুধু অতুলবাবু একা। আমি বাড়ি ছিলাম না, সাবিত্রী দিলো খবরটা। বললো—বাবা এসেছিলেন, জানো? এই দেখ, কতো চাল-ডাল আর আলু, কুমড়ো, —এই সব দিয়ে গেছেন।

সাবিত্রী আরও বলল—এত করে বললাম, একটুও বসলেন না। বললেন—এতটা পথ যেতে হবে, আজ আমি আসি মা।

সাবিত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে কতো কথা বলতে লাগল, তার উত্তরে আমি পারিনি একটি কথাও বলতে। বুকের ভিতর দিয়ে কী-যেন একটা ঠেলে-ঠেলে উঠতে লাগল, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল।

এমনি, একদিন ছুদিন নয়, প্রায়ই আসতেন তিনি। এসে, কিছু-না-কিছু দিয়ে যেতেন। কোথা থেকে যে কিভাবে উনি ওসব দিয়ে যেতেন, সাবিত্রীর মতো সরল মেয়ে সেটা ঠিক না বুঝলেও, আমার কাছে অবোধ্য কিছুই থাকত না। ওঁর কাঁধের সেই ঝুলিটার কথা মনে পড়ত। বলেছিলেন—আমাদের ভালবাসে সবাই। ঠাকুরটিকে দেখে যার যা ক্ষমতা, ছুটি-ছুটি ঢেলে দেয় এই ঝুলিতে।

কথায় বলে, দিন সমান যায় না মানুষের। ভাবতে শুরু করেছিলাম, ওটা কথার কথা। জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ওটা নিছক এক সান্ত্বনার বাণী। কিন্তু হঠাৎই ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। অতুলবাবুর আসা-যাওয়া করবার দিন কতক পরেই এলো একটা চিঠি। কোনো মুরুব্বি নয়, কোনো সুপারিশ নয়, নেহাৎই খবরের কাগজ দেখে দরখাস্ত-করা এক চাকরির যোগসূত্র। দেশী এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মফস্বল-শাখা। অবিলম্বে যোগদানের চিঠি এসেছে।

কিন্তু 'অবিলম্বে' যোগদানই কি সহজ কথা আমার পক্ষে? বাড়িওয়ালা, মুদি, ছুধ—সব মিলিয়ে ঋণের পরিমাণই ছুশো টাকা। তার ওপরে যাতায়াতের প্রশ্ন আছে। সাবিত্রীর গায়ে সোনাদানা বলতে কিছু নেই, এমন কি বাসন-কোসন পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। সম্বলের মধ্যে ওর সেই বিয়ের ট্রাঙ্কটা, তাতে আমাদের তিনজনের সামান্য জামাকাপড়, আর বিছানা।

সময়ের মোড় বোধ হয় ঘুরেছে। না হলে, চাকরির চিঠি মাত্র দেখিয়ে পাওনাদারদের নিরস্ত করতে পারতাম না। বললাম—রেখে দিন ঠিকানা। টাকা মারব না। মাসে-মাসে শোধ করব।

ছুধ, মুদি, বাড়িওয়ালা—সবাই কিন্তু বিশ্বাস করল আমাকে।

মনে মনে অবাকই হলাম। ভাবলাম, একালে এ-ও ঘটে। আরও আশ্চর্য, চাকরির চিঠি দেখিয়ে শ্বশুরের কাছ থেকেও ঋণ পেলাম পঞ্চাশটি টাকা।

প্রথমে আমি নিজে গিয়ে অফিসে দেখা করে, বাসা ভাড়া করে চলে এলাম সাবিত্রীদের নিয়ে যাবো বলে। সাবিত্রী বললে—বাবা আজও এসেছিলেন জানো? চাল-ডাল দিয়ে গেলেন। গৌরীর হাতে আজ আবার একটা ঝুমঝুমি পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। বললাম—ওঁর চাকরি হয়েছে, জানেন? আমরা শিগগিরই চলে যাবো। চাকরির কথা শুনে খুশি হলেন খুব, আবার চলে যাবো শুনে দুঃখিতও কম হলেন না। তোমাকে বলব কী, চোখে ওঁর জল এসে গেল। তোমাকে খুব ভালবাসেন, না?

বললাম—তোমাকেও কি ভালোবাসেন কম?

—তা সত্যি!—সাবিত্রী বললে—ওঁর মেয়ে সুন্দরীই ছিল বলে শুনেছি, অথচ, আমার মতো এই কাল পেঁচীকে দেখে কি বলেন জানো? বলেন—আমার দুখুর মুখের সঙ্গে ভয়ানক মিল আছে। হ্যাঁগো, তাই কি হয় নাকি? ভালবাসেন কিনা, তাই অমন মিল দেখতে পান। যাকে বলে, মন-গড়া মিল!

গাঢ় কণ্ঠে বললাম—কতো বড় মন থাকলে মানুষ ও মিলটা প্রত্যক্ষ করতে পারে, বলো তো সাবিত্রী!

সাবিত্রী বললে—মাকে কিন্তু আর সঙ্গে করে আনেননি। বলেন—এতোটা পথ বুড়ী আসতে পারবে না! শরীরটা ওর ভালো নয়! নইলে, সে তো আসতে পারলে বাঁচে!

একটু থেমে, তারপরে সাবিত্রী আবার বললে—এবার ওঁদের নিয়ে এসো তুমি। ভালো করে রেঁধে একদিন খাওয়াই। শুধু তা-ই বা কেন! দুটি তো প্রাণী, আমাদের সঙ্গে ওঁদের নিয়ে গেলে হয় না?

—তুমি বলছ!

উৎসাহে ও একেবারে উঠে বসেছে ততক্ষণে। বললে—আমি

বলব না তো, কে বলবে ! মা বাবা থেকেও মা-বাবার স্বাদ পাইনি। 'হতচ্ছাড়ী' 'মুখপুড়ী' ছাড়া কোনো কথা শুনিনি। আর ওঁরা ?

বলতে-বলতে আবেগে গলা ধরে এলো সাবিত্রীর, বললে—আমার লক্ষ্মী-মা, আমার মিষ্টি মা, সব সময় ওঁদের মুখে যেন লেগেই রয়েছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ওঁদের তুমি কালই সঙ্গে করে নিয়ে এসো। হাত-পা এযাবৎ আমাব বাঁধা ছিল। এবার আর ওঁদেব আমি ছাড়ব না !

কিন্তু, ওঁদের যে সত্যিই কাছে বাখব, এমন ভাগ্য কি কবেছি ? পরদিনই গেলাম কালীঘাটে। মন্দিবে, এধাবে ওধাবে, আন্দাজে-আন্দাজে কোথায় না ঘুরেছি ? কোথাও সন্ধান পেলাম না। অবশেষে মায়েব মন্দিবে ঢুকতেই, ডানদিকে যে আগাগোড়া সিঁদুব-মাখানো গণেশ-মূর্তিটি চোখে পড়ে, সেইখান থেকে উদ্দেশ মিলল তাঁদেব। বার কতক যাতায়াত কবেছি তো ? আমাকে ওঁবা লক্ষ্য করে থাকবেন। গণেশ-মূর্তিব কাছে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ডেকে একসময বললেন—কাউকে খুঁজছেন—আপনি ?

—আজ্ঞে হ্যা।

বলে, নাম বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে, কী আশ্চর্য, চিনতে পাবলেন উনি। তাবপবে, আমার দিকে ভালো কবে তাকিয়ে বললেন—তাহলে আপনিই কি সেই, যাকে ঠাকুরমশাই 'জামাই' বলে ডাকতেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বললেন—আপনার কথা খুব বলতেন আমাদের কাছে। এইখানে এসে বুড়ো-বুড়ী মাঝে মাঝে বসতেন কিনা। গল্পসল্প করতেন। সেদিন বললেন—গোবিন্দ মুখ তুলে চেয়েছেন। জামাইয়ের কাজ হযেছে। এইবার নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়তে পারব।

—কোথায় ওঁরা ?

ভদ্রলোক বললেন—এদিককার সবাই ওঁদের ভালবাসতেন। চাঁদা

করে প্রত্যেকে কেউ আট আনা, কেউ এক টাকা দিয়েছে। সামান্যই টাকা। কিন্তু সেই সম্বল করে ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন বৃন্দাবনের পথে। গতকালই ওঁরা রওনা হয়ে গেছেন বলে জানি।

বৃন্দাবন! হঠাৎ সেই খাঁতুর সীমাচলমের কুমারী মায়ের কথা মনে পড়ল। তিনিও বলেছিলেন, যার কোথাও কোনো গতি নেই, তার গতি গোবিন্দর শ্রীচরণ, বৃন্দাবন!

ফিরে এলাম বাড়ি।

তারপরে, আমার কর্মস্থল। কবি জয়দেবের 'কেন্দুবিল্ব' বা 'কেঁদুলী' বলে যে গ্রাম আছে, প্রতি বছর যেখানে হয় 'জয়দেবের মেলা',—তারই একেবারে কাছে আমার কর্মস্থল। এ-ও এক ঠিকাদার কোম্পানীর অফিস। এ অঞ্চলের সন্নিকটবর্তী স্থান নিয়ে পথঘাট বিস্তৃত হচ্ছে, সেই সূত্রে, এখানে কোম্পানী এনে জড়ো করছে যতো সব টুকরো পাথর, ড্রামভর্তি পিচ এবং আরও বহু জিনিস। এ ছাড়া, ইটখোলাও তৈরী হলো প্রকাণ্ড। এই সব জিনিসপত্র, কাজকর্ম দেখাশোনা করার ভার পড়ল আমার ওপর। আমার মাথার ওপরে অবশ্যই রইলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার, এবং আরও অনেকে। তবে তাঁরা সব ভ্রাম্যমাণ।

কাজ করতে করতে একথাই সবিস্ময়ে ভাবতাম, এ চাকরি, কারুর সঙ্গে জানা নেই শোনা নেই, মাত্র আবেদনপত্র পাঠিয়ে, আমি পেলাম কী করে? ইঞ্জিনিয়ারের নাম মিঃ ভাবা, কথায় কথায় একদিন বেরিয়ে পড়ল, উনি বম্বের লোক। শুধু তা-ই নয়, ওঁর সঙ্গে যখন ক্রমে ক্রমে আরও অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছি, তখন শুনলাম, আমাদের কোম্পানীর প্রধানতম পরিচালক মিঃ নাদকার্নী নিজে আমার আবেদন-পত্র পড়েছিলেন, এবং আমার চাকরি হবার মূলে উনি।

এটা জানবার পর, আমি একটা ব্যক্তিগত পত্র পাঠিয়ে মিঃ নাদকার্নীকে জানিয়েছিলাম ধন্যবাদ। তিনি উত্তরে এক ব্যক্তিগত

পত্রেই আমাকে জানালেন, ধন্যবাদ আমাকে নয়, ধন্যবাদ তোমার জানানো দরকার যাঁকে, তাঁর নাম শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ। তিনিই তোমার নাম বলেন, এবং আশ্চর্য যোগাযোগ,—বক্স-নাম্বার বিজ্ঞাপনের আহ্বানে তুমিও আবেদন করেছিলে। শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ আমাদের সাব-কনট্রাক্টর ছিলেন কিছুদিন, সেই সূত্রেই তাঁকে আমি জানতাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের পরিচালকবর্গ সাব-কনট্রাক্টরী সিষ্টেম বন্ধ করে দেওয়ায়, তাঁকে আর কোনো কাজ দিতে পারছিলাম না।

শুধু অবাক হওয়াই নয়, মনটা আমার শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠল। সব কথা গিয়ে বলেছিলাম সাবিত্রীকে। ওকে ছাড়া কাকেই বা মন খুলে সব কথা বলব? কে আছে আমার?

শুনে, ওর চোখদুটি ছলছল করে এলো, বললে—চিঠি লিখে দাও।

দিলাম। সোমেশ্বরকেও দিলাম। মিঃ নাদকার্নীকেও দিলাম। সোমেশ্বরের কাছ থেকে পেলাম না উত্তর। উত্তর এলো মিঃ নাদকার্নীর কাছ থেকে। লিখেছেন—খবর নিয়ে জানলাম, শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ ব্যবসা করবার মানসে আফ্রিকা চলে গেছেন। ঠিকানা ঠিক জানা গেল না।

কেমন যেন উদাস হয়ে গেল মনটা। এরা যেন সবাই ঠিকানা-বিহীন! কোনো বিশেষ ঠিকানা দিয়ে এঁদের আবাসস্থল চিহ্নিতও বুঝি করা যায় না। সত্যিকার 'গডস্ ম্যান' বোধহয় এঁরাই!

দিন যায়। দিন যায় এভাবে, কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। বার গেল, বছর ঘুরে এলো। সোমেশ্বর চিঠি দেয়নি, কিন্তু মিষ্টার নাদকার্নীর পত্র থেকেই জেনেছিলাম, সোমেশ্বর আফ্রিকাতেই স্থিতি হয়েছে, এমনকি তার পরিবারবর্গকে চিঠি দিয়ে নিয়ে গেছে সেখানে। দেশে ওর স্থান হলো না, স্থান হলো বিদেশে। তা হোক, তবু যে সে ভালো আছে, এ সংবাদেও আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু, এ তো গেল সোমেশ্বরের কথা, অতুলেশ্বর বাবুর সংবাদ কী? তাঁরা কেমন আছেন? সাবিত্রী

আড়ালে কাঁদে। জিজ্ঞাসা করলে বলে—কিছু না।

একদিন অনেক পীড়াপীড়ি করতে শেষ পর্যন্ত বললে—মা-বাবার জন্য বড্ড মনকেমন করে! তুমি কিছুতেই ওঁদের ধরে রাখতে পারলে না?

বুঝলাম, কাদের কথা বলছে সাবিত্রী। বুঝলাম, কাদের কথা স্মরণ করে লুকিয়ে লুকিয়ে সে কাঁদে।

একটা কথা আছে, সময় সব-কিছুর ওপর ক্রমে ক্রমে আস্তরণ বসিয়ে দিয়ে যায়! কালে কালে মানুষ নাকি একদিন সবই ভুলে যায়। আমিও ধীরে ধীরে ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম সেই জরাজীর্ণ দেহ, চোখে পুরু চশমা, হাতে মোটা লাঠি। ভুলে গিঁয়েছিলাম চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ী পরা সেই প্রসন্ন মাতৃমূর্তিটির কথা। কিন্তু আজ মনে হয়, সত্যিই কি ভুলে গিয়েছিলাম? আমার জীবনের ভিত্তিভূমিতে তাঁদের ভূমিকা, হোক না তা' নেপথ্যের, এতই কি অকিঞ্চিৎকর, যে আমাদের বিস্মরণ ঘটবে চিরতরে?

আর একবার দেখা পেয়েছিলাম। প্রতিবৎসরে একটা মেলা হয়, সেকথা তো আগেই জানিয়েছি। এই রকম, একবার এক মেলায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি, একটা গাছতলায় প্রচুর ভীড় জমেছে।

কোনো অসাধারণ বাউলের অধিষ্ঠানই বোধহয় ঘটেছে ভেবে, ভীড় ঠেলে কাছে গেছি, দেখি—তিনি।

সেই জরাজীর্ণ চেহারা আরও ভেঙে পড়েছে, চোখে সেই পুরু চশমা, হাতের লাঠিটি পাশে পড়ে আছে, আর পড়ে আছেন পায়ের কাছে লাল চওড়া পাড়।সাদা শাড়ী পরনে, আমাদের সেই মা। মুখের কাছে কয়েকটা মাছি ভনভন করছে। অথচ শুয়ে আছেন যেন আশ্চর্য এক প্রশান্তি নিয়ে, যেন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন তিনি।

চিনতে দেরী হবার কথা নয়। সাবিত্রী ছিল আমার সঙ্গে। গৌরীকে ঝিয়ের কাছে বাড়িতে রেখে আমরা দুজনে মেলা দেখতে বেরিয়েছিলাম। সাবিত্রী ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি দুঃখকষ্টের মধ্য

দিয়ে বেড়ে ওঠা পুরুষ, আমার চোখে সহজে জল আসতে চায় না।

নিঃঝুম-হয়ে-বসে-থাকা মূর্তিটির কাছে গিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। বৃদ্ধ মুখটা তুললেন। মুখে ফুটে উঠল সেই অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত হাসি, বললেন—কে? জামাই?

—হ্যাঁ।

বললেন—এই কিছুক্ষণ আগে গোবিন্দ ওকে পায়ে টেনে নিয়েছেন। কলেরা হয়েছিল।

তারপরে, সারাটি দিন কেটে গেল মায়ের শেষকাজ নিয়ে।

শ্মশানে দাহকার্য সমাপ্ত করে যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে, অনেক পীড়াপীড়ি করে বৃদ্ধকে কাছে নিয়ে এসেছি। আমার বাড়িতে।

সাবিত্রী বললে—বাবা, আর কোথাও যাবেন না আপনি। এখানেই থাকবেন—কেমন?

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টি, বললেন—থাকব!

সাবিত্রী বললে—থাকুন বাবা, মেয়ে-জামাইয়ের কাছে।

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন—হুঁ, থাকতে হবে। সতীলক্ষ্মী গেলে, ওর শ্রাদ্ধশান্তিটাও করে যেতে হবে।

—সে-সব ব্যবস্থার কথা আপনি ভাববেন না বাবা, আপনার জামাই-ই তো রয়েছেন। আপনি আমাদের কাছে থাকবেন এবার থেকে। আমি তো আপনার মেয়ে, না বাবা?

মুখমণ্ডলে দেখা দিলো সেই হাসি, বললেন—হ্যাঁ মা, মেয়ে বই কি! আমার রাজেন্দ্রাণী মেয়ে।

যে-ঘরে বসে আমি লেখাপড়া করতাম, সেই ঘরে যত্ন করে ওঁকে শুতে দিলো সাবিত্রী। ঘরের কোণে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হলো।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দুজনে ওঁর ঘরে ছিলাম।

শেষ পর্যন্ত, ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসছে, তখন গেলাম আমাদের ঘরে শুতে। দেখি, খাটের ওপর ঘুমুচ্ছে গৌরী, আর ঝিটি ঘুমুচ্ছে মেঝের ওপরে, আঁচল পেতে।

সাবিত্রী বললে—বাবাকে পেয়েছি অনেক ভাগ্যে, এটা জানবে। ওঁকে কিন্তু আর ছাড়া হবে না।

—না।

কিন্তু, সকালে উঠে, ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা শূন্য।

প্রথমে ভাবলাম, বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবেন।

বসেই আছি ওঁর বিছানার একটি পাশে। সাবিত্রীও এলো একসময়। বললে—বাবা কোথায়? একটু চা করব?

যেন চমক ভাঙল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, আমার টেবিলের ওপরে একটা কাগজ চাপা দেওয়া।

কেমন যেন সন্দেহ হলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি, আঁকা বাঁকা অক্ষরে বড়ো-বড়ো করে লেখা,— 'জামাই। এ যাবৎ যা-ই কেন না পেয়েছি, শোক দুঃখ আর আনন্দ, —চিরটাকাল দুজনে সমান ভাগ করে নিয়েছি। আজ সে গেল পথে, আমি ঘরে থাকি কী করে? তাই আমিও চললাম। আমার খোঁজ করো না। ইতি—'

আজ জীবনের সব কথা যখন একা-একা স্থির মনে ভাবতে বসি, তখন মনে হয় সেই খাঁদু, তার সামাচলমের মা, সুদক্ষিণা, সুদক্ষিণার মা আর বাবা, এরা বুঝি বিশেষ এক গ্রহের মানুষ, কেমন করে হঠাৎ যেন গ্রহান্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে! কী-এক অদৃশ্য আলোক-লতার সূত্রে এঁরা গাঁথা,—চেহারায় ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এক! এরা আমার

জীবনের নেপথ্যলোকে ছিল বলেই, আমার জীবন সংঘাতসঙ্কুল হয়েও সুন্দর, সামান্য হয়েও অসামান্য। জীবন সম্বন্ধে লোকে হতাশ হয়; আমি হতে পারি না, হয়তো এদের দেখেছিলাম, এদের পেয়েছিলাম বলেই। এক হিসাবে আমি ভাগ্যবান।

শেষ